সাক্ষাৎকার
তানভীর মোকাম্মেল

প্রশ্ন : ১) আপনার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার জন্ম খুলনা শহরে, আমাদের পৈতৃক বাড়ী *"মোকাম্মেল মঞ্জিল"*-য়ে। গেটে শিউলী ফুলওয়ালা সুন্দর ওই দোতলা বাড়ীটিতে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। একটা লোহার বাঁকানো সিঁড়ি ছিল ছাদে ওঠার। সেখানে আমার শিশু বয়সে অনেক ছুটোছুটির স্মৃতি আছে। বেশ বড় বাড়ী। বাড়ীর ভেতর খেলার উঠান ছিল। এ বাড়ীতেই মা একটা স্কুল করেছিলেন, আমার এক ভাইয়ের নামে– *হেলাল মেমোরিয়াল স্কুল*। আমার জন্মেরও আগে আমার এই ভাইটি ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু বাবা-মা দু'জনেই তাঁদের নিজেদের যোগ্যতায় খুলনা শহরের শ্রদ্ধেয় নাগরিক ছিলেন, ফলে আমাদের পরিবারটি বেশ পরিচিত ছিল আর আমাদের বাড়ীর চারপাশেই ছিল আমার প্রিয় বন্ধুদের এবং নিকট আত্মীয়দের বাড়ী-ঘর। ফলে খুব নিরাপদ, নিশ্চিত ও আনন্দময় এক শৈশব কেটেছে আমার। আট ভাই-বোন ছিলাম আমরা। বাবা সরকারী চাকুরীজীবি হওয়ায় ওঁর বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং হোত। যেহেতু আমাদের আট ভাই-বোনের স্কুল-কলেজ দু'বছর পর পর পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না, আর যেহেতু মা খুলনা আযম খান কমার্স কলেজে শিক্ষকতা করতেন, একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং নানারকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন, ফলে মা-র পক্ষেও বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। এরকম একটা আয়োজন ছিল যে, আমরা খুলনায় মা'র কাছে থাকবো এবং বাবা চেষ্টা করবেন খুলনার কাছাকাছি পোস্টিং নেবার।

আমরা চার ভাই, চার বোন। আমি পাঁচ নম্বর। *হেলাল মেমোরিয়াল স্কুলে* আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ি। এরপর কিছুদিন পড়ি ইংরেজী মাধ্যমের *পোর্ট কিন্ডারগার্টেন স্কুলে*। তারপর আমি *সেন্ট যোশেফ স্কুলে* ভর্তি হই। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করি। *সেন্ট যোসেফ স্কুলটা* আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল। স্কুলের শিক্ষকরা আমাদের পরিবারকে চিনতেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফাদার এ জি ব্রুনো, ইতালিয়ান। যেহেতু আমি পরীক্ষায় ভালো করতাম, ফলে তিনি খুব স্নেহ করতেন আমাকে।

ছোটবেলায় আমার ছিল খুব ক্রিকেট খেলার নেশা। সে সময় আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে খেলার মাঠে। আমি খুব অল্প বয়সেই প্রথম বিভাগে ক্রিকেট খেলতে শুরু করি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশীপে খুলনা জেলা দলের পক্ষে প্রথম হাফ সেঞ্চুরী করেছিলাম মনে আছে! তখন ক্রিকেট ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান।

প্রশ্ন : ২) কোন্ দলের বিপক্ষে খেলেছেন?

উত্তর : বরিশালের বিরুদ্ধে। তখনতো জেলায় জেলায় খেলা হতো। আমরা তখন খুলনা মাঠের তারকা! খুলনার সবাই একসময় আমাকে কেবল ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবেই চিনতো। আমার চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেকেই তাই অবাক হয়েছিলেন। তবে ক্রিকেটের মাঠ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। শৃঙ্খলা, টিম স্পিরিট অর্থাৎ যৌথভাবে কাজ করা, যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর মানসিকতা। আমাদের কোচ ট্রেনিং দিয়েছিলেন যে, পেস বোলার যখন ব্যাটস্ম্যানকে ঘাবড়িয়ে দেয়ার জন্য একটার পর একটা বাউন্সার দেবে তখন মাথা ঠান্ডা রেখে বোলিং লাইনে

নিজের মাথাটা নিয়ে যেয়ে হুক্ করতে হবে। কারণ ঐ অবস্থায় ব্যাট চালালে শরীরের নিজস্ব নিরাপত্তার নিয়মে সেটা বলে লাগবেই! কিন্তু অনেকে আহত হওয়ার ভয়ে নার্ভাস হয়ে যায় বা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ফলে আউট হয়ে যায় বা শরীরে বল লেগে আহত হয়! আমাদের সময়ে ক্রিকেট পিচতো এখনকার মত মসৃণ ছিল না। বিশেষ করে খুলনার মত শহরে। অনেক সময় এবড়োথেবড়ো পিচে আমাদের খেলতে হতো, অনেক সময় ম্যাট পিচে। ম্যাট পিচে বল হঠাৎ করে লাফাতো। আর তখনতো প্রতি ওভারে কয়টা বাউন্সার দিতে হবে, সেরকম কোন বাঁধাধরা নিয়মও বোলারদের জন্যে ছিল না। ফলে মাথাটা ঠিক রেখে খেলতে হতো। এটা একটা উদাহরণ দিলাম। কারণ পরবর্তী জীবনে নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও ধীরস্থিরভাবে কাজ করে যাওয়ার কিছু শিক্ষা বোধহয় আমি ক্রিকেট মাঠ থেকে পেয়েছিলাম। আমি বয়স্কাউটও ছিলাম। ওখান থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন : ৩) কোন ক্লাসে বয় স্কাউটে যোগ দিলেন?

উত্তর : স্কুলের শুরু থেকেই। প্রথমে ছিলাম কাব। কিন্তু আমার আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে ক্লাস সিক্সে থাকতেই আমাকে বয়স্কাউটে নিয়ে নেয়া হোল। সাধারণত ক্লাস সেভেনের আগে কাউকে নেয়া হতো না। সেই একই কথা কিন্তু ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রেও। আমি খুলনার প্রথম বিভাগে যখন খেলেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর! আমার যেহেতু পারফরমেন্স ভাল ছিল, ক্লাস সেভেনে থাকতেই আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কাউট জাম্বুরীতে পাঠানো হল, করাচীতে। সেখানে প্রথম বিভিন্ন দেশের প্রচুর স্কাউট দেখলাম এবং অনেকের সাথেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৪) কত সালে?

উত্তর : সিক্সটি সেভেনে। যাওয়ার সময় প্লেনে গেলেও আমরা করাচী থেকে চট্টগ্রামে ফিরেছিলাম জাহাজে। নয় দিনের জাহাজ ভ্রমণ! সেটা আমার জীবনের এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

আমার ওই সময়ের জীবনে খেলাধুলাটাই মূল ছিল। শুধু ক্রিকেট না, ব্যাডমিন্টন আর টেবিল টেনিসও খুব খেলতাম। সে সময় আশেপাশে অনেক মাঠ ছিল। আর মাঠের মত পুকুরও অনেক ছিল। খুলনার প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই পুকুর ছিল। আমার অনেক সময় কাটতো সাঁতার কেটে। আমার এক ভাই পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। যার নামে মা *হেলাল মেমোরিয়াল স্কুলটা* করেছিলেন। ফলে আমি অনেকক্ষণ বাসায় না ফিরলে মা খুব চিন্তা করতেন। কিন্তু ঐ বয়সে কি আমাদের আটকানো যায়!

প্রশ্ন : ৫) ছেলেবেলায় আর কোনো আনন্দে কি ডুবে থাকতেন?

উত্তর : ছেলেবেলায় আমার আর একটা আনন্দ ছিল, শিকার করা। খুলনার দক্ষিণে বিরাট বিল ছিল। যতদূর চোখ যায়, ততদূর বিস্তৃত ছিল বিলটা। মাঝে মধ্যে কিছু ধানক্ষেত দেখা যেত। আমাদের পরিবারটা শিকারী পরিবার। অল্প বয়সেই আমি একটি এয়ারগানের মালিক হয়েছিলাম। ছুটির দিনে সকাল হলেই কোন এক সঙ্গী নিয়ে খুলনা শহরের দশ-বিশ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে চলে যেতাম পাখী শিকার করতে। ঘুঘু, বক, মাছরাঙা এসব পাখী। তবে এখন আমি আর কোনো পাখী শিকার করতে পারবো না। আমার খুব অপরাধবোধ জাগে! তবে অনেক সময় শিকার করতে না গেলেও শীতকালে বিলে বেড়াতে যেতাম। বিলে যাওয়াটা আমাদের ঐ পাড়ার ছেলেমেয়েদের একটা আনন্দ ছিল। ঐ যে উন্মুক্ততা! এখন বুঝি, সবকিছু থেকে মুক্তি, বাড়ীর

কোনো বাঁধা নেই, ঐ ধানক্ষেতের মাঝে দৌড়ে বেড়ানো, এটা আমার ভাল স্মৃতির মধ্যে একটা। কয়েকটা ছেলেমেয়ে আমরা উন্মুক্ত বিলে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, খেলছি। আমরা যারা একটু সাহসী গোছের তারা বিলের পানিতে নামছি, সাঁতার কাটছি।

আর আমার ছিল বই পড়ার শখ। সেটা খুব অল্প বয়স থেকেই। বাড়ীতে প্রচুর বই ছিল। বাবা ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়েছিলেন, মা বাংলা সাহিত্যের শিক্ষয়িত্রী। আমার বড় ভাইও ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। ফলে বাড়ীতে বইয়ের কোনো কমতি ছিল না। খুব ভাল ভাল বই-ই ছিল। ফলে অল্প বয়সেই আমি অনেক ধ্রুপদ বই পড়ে ফেলি। শুনে অবাক লাগবে আট-দশ বছর বয়সেই আমি বুঝি না বুঝি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়া শুরু করি, গোগ্রাসে পড়তাম। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজী বই পড়ার নেশা হোল। আর রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। তখন পড়েছি, এখনও পড়ছি!

প্রশ্ন : ৬) আপনার এই নিখাদ আনন্দময় অনুভূতির মধ্যে কি বিষন্নতার কোন ছোঁয়া ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, বিষন্নতাও ছিল। সংবেদনশীল ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের চারপাশে একটা পরিবর্তন ঘটছে। খুলনা ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। ১৯৪৭ সালে খুলনার একান্ন ভাগ জনগোষ্ঠী ছিল হিন্দু। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় খুলনা তো প্রথম দু'তিনদিন ভারতের মধ্যে পড়েছিল। ষাটের দশকেও আমার অনেক খেলার সাথী, স্কুলের বন্ধু, শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশীরা হিন্দু ছিলেন। সবাই কিন্তু মিলেমিশে থাকত। দূর্গা পুজা হলে পাড়ার সবার মধ্যেই একটা উৎসব-উৎসব ভাব লেগে যেত। আর হিন্দু বন্ধুরা সরস্বতী পুজা করার সময় আমরা তাদের সাথে থাকতাম। আমরাও বিশ্বাস করতাম, দেবী সরস্বতীকে খুশী করতে পারলে পরীক্ষায় ভাল হবে! ওরকম পরিবেশে আমরা বড় হয়েছি। তবে চৌষট্টিতে কাশ্মীরের হযরত বাল নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, সে দাঙ্গাটাতে খুলনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সবুর খান বলে খুলনায় মুসলিম লীগের এক নেতা ছিল। মাড়োয়ারী আর ধনী হিন্দুদের বাড়ীঘর, জমি-জমা আর ব্যবসাপাতি দখল করার জন্যে কাশ্মীরে-মুসলমানেরা-নির্যাতিত-হচ্ছে সেই অজুহাতে সবুর খানের গুন্ডাপান্ডারাই খুলনায় দাঙ্গাটা বাঁধায়। এই দাঙ্গাটা আমার মনকে বেশ নাড়া দেয়, কারণ দাঙ্গাটা আমি দেখেছি। তখন আমি একজন কাব। খুলনার দৌলতপুরের পাশে মহেশ্বরপাশা বলে একটা জায়গা আছে। সেইখানে আমার জীবনের প্রথম স্কাউট ক্যাম্পে যোগ দিয়েছি তখন। সেখানকার কৃষি কলেজের মাঠে ক্যাম্প হচ্ছে। মহা আনন্দে সেই ক্যাম্পের দিনগুলি কাটছিল। একদিন স্যাররা হঠাৎ বললেন, আমরা যেন কেউ ক্যাম্পের বাইরে না যাই। সেদিন জীবনে প্রথম দাঙ্গা দেখলাম। মহেশ্বরপাশা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। শত শত লোক লাঠি নিয়ে ঐসব গ্রাম আক্রমণের জন্য দৌড়ে যাচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছিল, কারণ তার আগে, অর্থাৎ বিকেলে আমি দেখেছি ওই গ্রামের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল! লাঠিসোটা নিয়ে ঐসব লোকদের দৌড়ে যাবার পরই কানে ভেসে আসলো চীৎকার, আর্তনাদ আর দেখলাম আগুনের দাউ দাউ শিখা। আমরা বুঝতে পারছিলাম নারকীয় কিছু ঘটছে গ্রামটায়! আমি তো তখন বেশ ছোট। সবেমাত্র কাব হয়েছি। ক্যাম্পে আমাদের যারা বড় ছিল অর্থাৎ স্কাউট, বিশেষ করে কলেজের সীনিয়র স্কাউট ভাইয়েরা, তারা স্যারদের বার বার বলছিলেন সেখানে যাবার অনুমতি দেবার জন্য এবং তারা এমনও বলছিল, যদি এই বিপদে মানুষের পাশে তারা দাঁড়াতেই না পারে তবে তাদের স্কাউটের ট্রেনিং নেয়া তো বৃথা! কিন্তু তারা সেদিন ক্যাম্প থেকে বের হবার অনুমতি পায়নি। আমরা শুধু ভয়াবহ সব আর্তনাদ শুনেছিলাম। ঘটনাটি সারাজীবনের জন্য আমার মনে দাগ কেটে যায়। খুলনা শহরে ফিরে এসে আমি দাঙ্গার আরেকটি রূপ দেখলাম। অনেক বাড়ীঘর ভাঙা, বিধ্বস্ত। ভীত-আতঙ্কিত অনেক হিন্দু পরিবার আমাদের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার মা খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। মা ওই দাঙ্গার মধ্যেই রিক্সায় করে শহরে ঘুরে ঘুরে সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিচিত হিন্দু পরিবারদের, বিশেষ করে নারী-শিশুদেরকে,

আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন আমাদের বাড়ীর নীচতলায় তারা অবস্থান করেছেন। বিপন্ন মানুষগুলো আমাদের বাড়ীটা হয়তো নিরাপদ আশ্রয় মনে করতেন। যেহেতু বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেহেতু বাড়ীটাতে আক্রমণের কোনো আশংকা ছিল না। তাছাড়া কলেজে শিক্ষকতা করার ফলে মাকে শহরের লোকজন চিনত ও মানত। অনেকদিন পরিবারগুলো থেকেছে আমাদের বাড়ীর নীচতলায়। সেখানেই রান্না, সেখানেই খাওয়া দাওয়া। পরে ধীরে ধীরে পরিবারগুলো অন্যত্র চলে যায়। ঘটনাটা আমার স্মৃতির মধ্যে খুবই স্পষ্টভাবে রয়েছে। ওইসব ভীত-সন্ত্রস্ত্র আতঙ্কিত মানুষের মুখ!

প্রশ্ন : ৭) আপনার *চিত্রা নদীর পারে*-র ঘটনায় কি আপনার বাস্তব জীবনের কোনো প্রতিফলন রয়েছে?

উত্তর : *চিত্রা নদীর পারে*-র যে দাঙ্গাপীড়িত ভীত মানুষ, সেরকম আতংকিত মানুষ আমি দেখেছি। স্বাধীনতার পরে আমি তেমনি দেখেছি আতঙ্কিত উর্দূভাষীদের। তখনও মাকে দেখেছি শহরের উর্দূভাষী বিপন্ন পরিবারের মানুষদের গাড়ীতে করে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতে স্থান দিচ্ছেন। তখন আমাদের গাড়ী হয়েছে। নিজেই গাড়ীতে করে ঘুরে ঘুরে উনি এসব কাজ করতেন। তিনি কোথা থেকে এত সাহস পেতেন এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে! সম্ভবত বেগম রোকেয়ার ছাত্রী হবার ফলে ওঁর মধ্যে এই ধরণের সাহস ছিল।

প্রশ্ন : ৮) আপনার মা বেগম রোকেয়ার সরাসরি ছাত্রী ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। আমার নানী ছিলেন বেগম রোকেয়ার বান্ধবী। আমি শুনেছি, বেগম রোকেয়া কলকাতায় আমাদের নানাবাড়ীতে প্রায় আসতেন। তিনি বোরখা পরায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু সেই সময়কার মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতার জন্যে ওঁকে বোরখা পড়তে হত। মা'র কাছে শুনেছি, উনি যখন পার্ক সার্কাসে আমাদের নানাবাড়ীতে আসতেন তখন বাড়ীতে ঢুকে নানীর নাম ধরে ডেকেই দরজার কাছ থেকে বোরখাটা খুলে বাতাসে উড়িয়ে দিতেন। বোরখাটা উড়ে উড়ে বাতাসে ভেসে মাটিতে পড়ত। সিনেমার একটা চিত্রকল্প যেন-- ওই বোরখার ভেসে ভেসে যাওয়া, খুব প্রতীকীও!

বেগম রোকেয়ার উদ্যোগেই মাকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করা হয়। মা বেগম রোকেয়ার খুব প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। মা'র ভাল নাম ছিল সাঈদা খাতুন, তবে ডাক নাম ছিল "বেগম"। মা যেহেতু ভাল ছাত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া তাই মাকে স্নেহভরে ডাকতেন "বেগমবাহার" নামে। মা'র কাছে গল্প শুনেছি ওঁরা যখন স্কুলে যেতেন, খুব অসুবিধা হত। মুসলমান মেয়েরা স্কুলে যাবে, এটা তখনকার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ তেমন মেনে নিতে পারতো না। স্কুলের নিজস্ব গাড়ী ছিল। কালো কাপড় দিয়ে গাড়ীটা ঢেকে তাদের স্কুলে যেতে হত। পার্ক সার্কাসের দু'একটা গলি ছিল, যেখানে অবাঙ্গালী রক্ষণশীল মুসলমানেরা বাস করত। গাড়ীটা যখন ঐ পথ দিয়ে যেত, লুম্পেন জাতীয় লোকেরা গাড়ীতে ঢিল মারত। বলতো *'কসবী যা রাহি হায়!' 'কসবী'* খুবই নোংরা শব্দ। মা এবং ওঁর সহপাঠিনীরা তখন খুবই বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে। তারা ভয়ে কাঁদতো বা চুপচাপ থাকতো। স্কুলের দু'একটা সাহসী আয়া ছিল। তারা গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাল্টা গালাগাল করতো। ঐটুক পথ ছিল মহা আতঙ্কের। তবে ঐ গলিগুলো পার হলেই আবার বৃহত্তর কোলকাতা শহর, সেখানে কোন সমস্যা হোত না। সেযুগে মা এবং তাঁর সহপাঠিনীদের স্কুলে যাওয়াটাই এক বড় সংগ্রাম ছিল! অল্পবয়সে আমার মায়ের লেখালিখির বেশ অভ্যাস ছিল। তখনকার *সওগাত, মোহাম্মদীতে* আমার মায়ের লেখা ছোট গল্প বের হোত। পরে ***"মাটির মেয়ে"*** নামে আমার মায়ের একটা ছোট গল্পের বইও বের হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯) আপনার কি মনে হয়, আপনার মায়ের কর্মকান্ড দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়েছেন?

উত্তর : বাবা-মা'র প্রভাবের ব্যাপারটাতো সবার জীবনেই কাজ করে। আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় মায়ের কিছু দিক হয়তো আমার ওপরে বর্তেছে। মায়ের যেসব চিত্রকল্প আমার চোখে ভাসে, সেই সবগুলোই হচ্ছে, উনি কোন না কোন কাজ করছেন। প্রচুর পরিশ্রম করতে পারতেন। দিনে সতের- আঠার ঘন্টাই উনি কাজ নিয়েই থাকতেন। আটটি সন্তানকে মানুষ করা, শিক্ষকতা করা, রান্না করা, এমনকি নিজে বাজারেও যেতেন। সে সময় ভদ্রমহিলাদের বাজারে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না। সম্ভবত, উনিই খুলনার প্রথম মহিলা যিনি নিজে বাজারে যেতেন, একটা কাজের লোক নিয়ে। যেহেতু উনি কোলকাতায় বড় হয়েছেন, ওঁর একটা বিদগ্ধ নাগরিক মন ছিল। নানা কাজের পরও উনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'ঝংকার' নামে, আমাদের বাড়ীতেই।

প্রশ্ন : ১০) আপনার মা কি নিজে সঙ্গীতের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর : উনি এস্রাজ বাজাতেন। অল্প বয়সে গান-টানও করতেন। গান-বাজনার প্রতি ওঁর আগ্রহ ছিল। শিল্পের দু'একটি দিক হয়তো আমি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি।

প্রশ্ন : ১১) আপনার বাবার কাছ থেকে ?

উত্তর : আমার বাবাকেতো খুব বেশী কাছে পেতাম না। চাকুরীসূত্রে উনি প্রায় বাইরে বাইরে-ই থাকতেন। আমার মনে হয় উনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, তা হচ্ছে একটি উন্নত রুচিবোধ। উনার মধ্যে পশ্চিমা সাহেবী ব্যাপার-স্যাপার কিছুটা ছিল। সবকিছু নিখুঁত হতে হবে। বাঙালি মধ্যবিত্তের জোলো আবেগ উনি অত পছন্দ করতেন না। আর তাঁর চরিত্রের যা আমাকে আকর্ষিত করতো তা হচ্ছে ওঁর ভদ্রতা বোধ। শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে এ শিক্ষা হয়তো আমি বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। আর ভালো সাহিত্য পড়ার রুচি এবং সবকিছু যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা, পশ্চিমা মানসিকতা বলতে যা বোঝায়, এসব কিছু কিছু দিক আমি হয়তো ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

প্রশ্ন : ১২) চৌষট্টির দাঙ্গা আপনার বালক মনকে কেমন নাড়া দিয়েছিল?

উত্তর : চৌষট্টির দাঙ্গা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যেহেতু সেই সময়ই আমার নানারকম প্রচুর বই পড়ার চর্চা গড়ে উঠেছিল, ফলে পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পরই আমার বালক মন বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তান ব্যাপারটা ভুঁয়া।

প্রশ্ন : ১৩) সেই সময় কি কি কারণে পাকিস্তান ব্যাপারটা আপনার কাছে ভুঁয়া মনে হয়েছিল?

উত্তর : অনেক কারণে। প্রধান কারণ হচ্ছে, চৌষট্টির দাঙ্গা। আমি দেখেছি, আমাদের সেরা স্কুল শিক্ষকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার সেরা বন্ধুরা চলে যাচ্ছে, পাড়ায় যারা ভালো মানুষ ছিলেন, ভালো ডাক্তার, উকিল, তাঁরা সব চলে যাচ্ছেন। এবং খারাপ কিছু মানুষরা, কেবল মুসলমান নাম বলেই, সেই সব জায়গায় চলে আসছে। মুসলিম লীগের বাজে লোকজন, ইতর-

বদমাশ টাইপের। যারা দাঙ্গা লাগাতো, তারা হিন্দুদের ঘরবাড়ীগুলো দখল করে চলে আসছে। তারাই শুধু পাকিস্তান-পাকিস্তান করতো। উর্দূভাষী যারা, যাদের লেখাপড়া নেই, বা ভালো কিছুরই চর্চা নেই, শুধু চাকু- ছুরি নিয়ে মারামারি হৈ চৈ করে বেড়াত, তারাই সব শহরের কর্তাব্যক্তি হয়ে যাচ্ছে। কোনোরকম সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা আর রইল না। অথচ খুলনা খুব চমৎকার রুচিশীল শহর ছিল। যেহেতু সংবেদনশীল ছিলাম, সে কারণে সেই অল্প বয়সেই বুঝতে পারছিলাম যে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবর্তনটা ভালো কিছু বয়ে আনছে না। আর কারণটা কি? অবশ্যই পাকিস্তান ও তার ভূঁয়োদর্শন।

প্রশ্ন : ১৪) সিক্সটি ফোরে আপনার বয়স কত ছিলো?

উত্তর : আমার তখন নয়-দশ বছর বয়স। ওতো হয়তো বুঝতাম না। কিন্তু আমার ভালো লাগতো না। তাছাড়া ষাটের দশকেতো বাঙালি চেতনা প্রবলভাবে জেগে উঠছিলো। যারা আমার শ্রদ্ধেয় এবং বড় ছিলেন তাদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতাম এক ধরণের অতৃপ্তি তাদের মধ্যে কাজ করছে। অবাঙালি ধনীদের উদ্ধত আচরণও দেখতাম। পাশাপাশি যারা হিন্দু ভালোমানুষ ছিলেন তাদের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম। যারা বামপন্থী ছিলেন তাদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে–এগুলি আমার মনে প্রবলভাবে দাগ কেটেছিলো। সেই সময় আমার জীবনে বই পড়ার বিষয়টা ব্যাপকভাবে জেঁকে বসে। প্রচুর ও সারাক্ষণ বই পড়তাম।

প্রশ্ন : ১৫) ঐ সময় কোন্ কোন্ লেখকের বই পড়তেন?

উত্তর : ছেলেবেলায় আমাকে শিকার কাহিনী খুব আকর্ষণ করত। জিম করবেট। তখনতো আমিও শিকারী! যদিও এয়ারগানের শিকারী। জিম করবেটকে আমার খুবই ভালো লাগতো। পরে বুঝেছি, তিনি সত্যিই একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ ছিলেন। শুধু শিকারী হিসেবেই ভালো নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি উন্নত একজন মানুষ ছিলেন। পরের দিকে পশু-পাখি রক্ষা করাই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এবং ভারতবর্ষের গরীব মানুষদের উনি খুব ভালোবাসতেন। ওঁর একটা বই আছে *"মাই ইন্ডিয়া"*। শিকার কাহিনী নয়, ভারতের গরীব মানুষদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের কথা তিনি লিখেছেন বইটিতে। বইটি পড়লে বোঝা যায় কত বড় মাপের একজন মানবিক মানুষ ছিলেন তিনি। আর শরৎচন্দ্র ভালো লাগত, বিভূতিভূষণ ভালো লাগত।

প্রশ্ন : ১৬) ঐ সময় শরৎচন্দ্রের কোন্ উপন্যাস আপনাকে বেশী নাড়া দিয়েছিল?

উত্তর : *'শ্রীকান্ত', 'দত্তা'* ও *'পথের দাবী'* তো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ীর অন্যদের কাছেও শ্রীকান্তের সংলাপগুলো মুখস্থ ছিলো। ইন্দ্রনাথ তো আমার কাছে একটি আদর্শ চরিত্র ছিল।

প্রশ্ন : ১৭) ইন্দ্রনাথ হারিয়ে যাওয়াতে কি কষ্ট লেগেছিল?

উত্তর : অবশ্যই। তবে এসব চরিত্র হারিয়ে যাওয়াই ভালো! পরে যদি ভুঁড়িমোটা বয়স্ক ইন্দ্রনাথ পাঠকদের সামনে হাজির হোত তবে ইন্দ্রনাথের আসল ইমেজটাই ধাক্কা খেত! এজন্য সেরা নায়করা অল্প বয়সে হারিয়ে যাওয়াই হয়তো ভালো!!

বাড়ীতে প্রচুর ইংরেজী বই ছিল। ফলে পশ্চিমা সাহিত্যও অনেক পড়তাম। ঐ সময়েই ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হোল। অল্প বয়সে ভালো লাগতো *ট্রেজার আইল্যান্ড, কিডন্যাপ* জাতীয় বই। জন্মদিন বা পরীক্ষায় ভালো করায় ঐ ধরণের বইগুলো উপহার পেতাম। তারপর বলতে পারেন আমি চালর্স ডিকেন্সকে আবিস্কার করি। সে সময় তাঁর *"দি গ্রেট এক্সপেক্টেশন"* ও *"অলিভার টুইস্ট"* আমার খুব ভালো লেগেছিল। যেহেতু ডিকেন্সকে ভালো লেগে গেল, ফলে তাঁর অন্য লেখাগুলোও পড়া শুরু করলাম। ডিকেন্স কিন্তু এখনও আমাকে খুব মুগ্ধ করে। তাঁর অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ, লন্ডনের গরীব মানুষের জীবনের চিত্র তো অনন্য। আমাদের বাড়ীতে বামপন্থার কোন ঐতিহ্য ছিলো না। সাধারণ আলোকিত বাঙালি পরিবার। কিন্তু দরিদ্র মানুষদের প্রতি ভালোবাসা, দুঃখবোধ, অল্প বয়স থেকেই কেন জানি আমার মধ্যে ছিল। আমাদের বাড়ীতে বেশ কয়েকজন কাজের লোক ছিল এবং দিনের অনেক সময় আমার তাদের সাথে কাটতো। তাদের গল্প শুনে, তাদের জীবনের কথা শুনে, কেন তারা কাজ করতে আসতো, ইত্যাদি শুনতাম। ওরা অধিকাংশই আসতো বরিশাল থেকে। বৃহত্তর বরিশাল জেলার নদীভাঙা এলাকাগুলো থেকে। এদের সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন মানুষ খুব গরীব ছিল। খাবারের অভাব ছিল প্রচন্ড। আমাদের এক কাজের ছেলে ছিল। বয়স খুব বেশী না, এগারো-বারো বছর। তাকেও অনেক কাজ করতে হোত। একটা ছড়া সে আমাকে প্রায়ই শোনাত। সে অনেক ভাত খেত। ফলে অনেকে এই নিয়ে তার সাথে ঠাট্টা করলে সে এই ছড়াটা বলতো;

"ভাত খামু না, খামু কি
ভাতের তন মিষ্ট কি?"

তো ভাত খেতে পারাটা একটা বড় ব্যাপার ছিল। আমরাতো তা বুঝতাম না। বরং খেতে চাইতাম না। যে বইটা অর্ধেক পড়া হয়েছে, মন থাকত সেদিকে। অথবা তাড়াতাড়ি খাবার টেবিল থেকে ওঠে দৌড়ে মাঠে যেতে হবে, খেলতে। অনেক সময় ধরে খাওয়াটা আমার কাছে সময় নষ্ট বলেই মনে হোত!

কাজের লোকদের খাওয়ার প্রতি এই অতিরিক্ত আগ্রহের ব্যাপারটা আমি ক্রমশ: বুঝতে পারি। তাদের দারিদ্র্য, কষ্ট, নদীভাঙন আর অনিশ্চয়তা। আমাদের বাড়ীতে একজন বৃদ্ধা কাজের মানুষ ছিলেন। শারীরিক কাজ করতে তার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারতাম। ছোটবেলায় আমি মা'কে প্রায় বলতাম, ওদের না রাখলে কি হয়। কিন্তু সেটাতো সম্ভব ছিল না। কাজের লোক ছাড়া তো সংসার অচল!

প্রশ্ন : ১৮) সেসব সময়ে কি আপনি স্কুলেই ছিলেন?

উত্তর : স্কুলেই। ক্লাস নাইন বা টেন-এ পড়তাম। তখন এয়ারপোর্ট ছিল যশোরে। খুলনায় কোন এয়ারপোর্ট ছিল না। ঢাকা থেকে কোনো আত্মীয়-স্বজন বা যেই খুলনায় যেতেন, যশোর এয়ারপোর্টে তখন আমাদের পরিবারের কাউকে গাড়ী নিয়ে যেতে হোত। যশোর এয়ারপোর্টে যাওয়া মাঝে মাঝে হোতই। এয়ারপোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে উৎসাহী আর কেউ ছিল না! কারণ দীর্ঘ পথে গাড়ী চালানোর আনন্দ। শিকারের মত গাড়ী চালানোর নেশাতেও আমার বেশ কিছু দিন গেছে।

প্রশ্ন : ১৯) ক্রিকেটও তো আপনার নেশা ছিল?

উত্তর : ক্রিকেটকে আমি ঠিক নেশা বলব না। ওই খেলাটা আমার সত্যিকারের ভালো লাগার একটা বিষয় ছিল। পরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়েছি। দুটো জিনিস ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি যখন কমিউনিস্ট হলাম আমার মনে হল যে, ক্রিকেট হো'ল ইংরেজ উপনিবেশবাদের এক শেষ প্রতিভূ, এটা খেলা যাবে না। আর গাড়ী চালানো যাবে না, কারণ এটা একটা বুর্জোয়া ব্যাপার! আমার গাড়ী চালানোর প্রতি প্রীতি দেখে ঢাকায় থাকার সময় বাবা গাড়ীটা আমাকে চালানোর জন্যে দিয়ে রেখেছিলেন। ঢাকার প্রথম জীবনে গাড়ীটা আমি সবসময়ই ব্যবহার করতাম। এটা ছিল আকাশী নীল রংয়ের একটা টয়োটা করোনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে কমিউনিস্ট হওয়ার পর গাড়ীটা বাদ দিয়ে আমি একটা সাইকেল কিনি। আমার এই সিদ্ধান্তের জন্যে তখন অনেকেই ঠাট্টা করতো! গাড়ীর জন্য আমার কখনো খারাপ লাগেনি, কিন্তু ক্রিকেটের জন্য আমার দুঃখ আছে। কারণ আমি খেলতে ভালোবাসতাম এবং মাঠে আমার খুব ভালো লাগতো।

প্রশ্ন : ২০) আপনি কি ঘোষণা দিয়ে ক্রিকেট ছেড়েছিলেন?

উত্তর : না, ঘোষণা দিয়ে নয়। আমার নিজের মনের বিশ্বাস থেকেই ক্রিকেট খেলাটা ছেড়ে দিই। আমার খেলার মাঠের বন্ধুরা কিছুটা অবাকই হয়েছিল।

প্রশ্ন : ২১) আপনি কমিউনিস্ট হলেন কবে? এর জন্য কেউ কি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

উত্তর : এটা স্বাধীনতার পরে। পঠন-পাঠন থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারছিলাম। তখন দেশে মার্কসবাদের বই আসা শুরু হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাও আমাকে খুবই আকর্ষণ করতো, এখনো করে। তবে আমার মনে হোত সাধারণ মানুষ অর্থাৎ গরীব মানুষদের জন্য আরো কিছু দরকার। দেশটা স্বাধীন হোল কিন্তু ওদেরতো তেমন কিছুই হোল না। সেই জন্য আওয়ামী লীগের থেকে কিছুটা বাঁয়ে আমার অবস্থান ছিল, হয়তো এখনো সেরকমই আছে। আর আমার সেই আকাঙ্খার প্রতিফলন আমি তখনকার *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে* খুঁজে পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ২২) কমিউনিস্ট পার্টির কোন ধারায়?

উত্তর : *সি পি বি* মানে *কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ*।

প্রশ্ন : ২৩) কত সালে?

উত্তর : ১৯৭৩ সালে।

প্রশ্ন : ২৪) আপনি কি তখন ঢাকায়?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি সত্তর সালে ঢাকায় চলে আসি। ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমরা ভর্তি হবার পর পরই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

প্রশ্ন : ২৫) তখন ঢাকায় কি আপনি একাই এসেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, হোস্টেলে থাকতাম। আমার হোস্টেল জীবনটা ভালো লাগতো। পড়াশুনার বালাই ছিল না! সত্তর-একাত্তর সাল। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ। আর সারাক্ষণ গল্প-গুজব, হৈ-চৈ। আমি যে রুমটায় থাকতাম, সেই রুমটায় রকিবুল হাসান (বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক) একসময় থাকতেন। উনি আমার দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন। উনি বিদায় নিলেন আর ঐ সিটটা আমাকে দেওয়া হোল।

প্রশ্ন : ২৬) একাত্তরে কী করলেন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হোল। কলেজ বন্ধ। পঁচিশে মার্চে আমি ঢাকায় ছিলাম। ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটের এক সরকারী বাড়ীতে আমার বড় বোন ও বোনের স্বামী থাকতেন। ওঁদের বাড়ীতে আমি তখন ছিলাম। পঁচিশে মার্চে র‍্যাংকিন স্ট্রিটের আশেপাশে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছিল। হিন্দু পরিবারদের উপর খুন-খারাপী হচ্ছিল। বাড়ীর সামনেই রেললাইন, যেটা এখন রাস্তা হয়েছে। আর সেই রেললাইনের পাশ জুড়ে ছিল বিশাল বস্তি। পাক-সৈন্যরা বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিল। গগণবিদারী কান্নার রোল, চীৎকার আর আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া। সে এক নারকীয় পরিবেশ! কাপ্তান বাজার কাছেই। কাজের ছেলেটা কোন কাজে বাইরে গিয়েছিল। ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ী ফিরলো। ওর সামনে ও দেখেছে বিহারীরা দু'জনকে মেরে ফেলেছে। সাতাশ তারিখে যখন কারফিউ তোলা হোল, আমাকে তো বাড়ীর বাইরে বের হতে দেবে না। কারণ তরুণ ছেলেরাতো তখন বিশেষভাবে টার্গেট ছিল। তারপরও কাউকে কিছু না বলেই আমি বের হলাম। সবার মনেই তখন আতংক। তবুও অনেককেই দেখলাম বের হয়েছে। পুরো রেললাইনের পাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে যে বস্তি ছিল, সেটা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই। কল্পনা করা যায় না সেই বীভৎস- নারকীয় দৃশ্য! এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মৃতদেহ পড়ে আছে। বিক্ষিপ্ত সব জিনিস পড়ে আছে। দেখলাম পাকিস্তানী সৈন্যদের বিশাল কনভয় নারায়ণগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। আশেপাশের বিহারীরা হাত নাড়ছিল আর বলছিল *পাকিস্তান জিন্দাবাদ*। আমরাতো কিছু বলছি না। সৈন্যদের চেহারা দেখছি, লাল চোখ, অস্বাভাবিক চাহনি। হাত ট্রিগারে। একটা সুরিয়ালিস্টিক পরিবেশ! যেটার কোন ব্যাখা হয় না। কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আমি এদিক- ওদিক হাঁটছি আর ধ্বংসযজ্ঞ দেখছি। হঠাৎ মনে হল আমার চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেছে অর্থাৎ আবার কারফিউ শুরু হবে। পাঁচ মিনিটও বাকী ছিল না। বঙ্গভবনের সামনে দিয়ে র‍্যাংকিন স্ট্রিটে যেতে হবে। আমি সেদিক দিয়েই তাড়াতাড়ি ফিরছি। হঠাৎ কানে আসলো *'হল্ট'!* বঙ্গভবনের সামনে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য। একেবারে রাইফেল উঁচু করে এক পাকিস্তানী খান সেনা আমার দিকে ট্রিগারে হাত রেখে তাক করে আছে। আমি দাঁড়ালাম। ঠিক উর্দূ না, উর্দূ হলে আমি বুঝতাম। সম্ভবত পাঞ্জাবী ভাষায় সে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছিল। ইঙ্গিত দেখে বুঝলাম যে, সে জানতে চাচ্ছে আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি ইংরেজীতে বললাম যে আমি বাড়ীতে যাচ্ছি। ও আবার বললো, কোথায়? আমি বললাম, র‍্যাংকিন স্ট্রিটে। তারপর আমি আবার হাঁটা শুরু করলাম। আবার সে বললো *'হল্ট'!* ওর হাতে রাইফেলটা তাক করেই ধরা ছিল।

প্রশ্ন : ২৭) আপনি কি তখন একাই ছিলেন?

উত্তর : আমি একদম একা। কিছুক্ষণ আগে দু'একজনকে আশেপাশে দেখেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবাই সরে গেছে। তারপরে সে বলে *"বেলা কুচ"*? বেলা কুচ মানে আমি বুঝি না। কিন্তু হঠাৎ বিজাতীয় শব্দটার একটা অর্থ আমার মনে হোল। যেহেতু স্কাউট জাম্বুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে

কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলাম। সে কারণে বুঝতে পারলাম যে একেবারে বিনা কারণে কেন আমি ঘুরছি সেটাই সে জিজ্ঞেস করছে। এখন বিষয়টি ভাবলে হাসি লাগে! কিন্তু আমি হঠাৎ-ই বলে ফেললাম স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম নিউজপেপার কিনতে! সম্ভবত সে স্টেডিয়াম ও নিউজপেপার শব্দ দুটি বুঝতে পেরেছিল। আমাকে যাবার ইঙ্গিত করলে আমি চলা শুরু করি। আমি রাস্তার ওই পারে গিয়ে পেছনে হঠাৎ 'খট' করে একটা শব্দ শুনলাম। রাইফেল কক্ করার শব্দ। তাকিয়ে দেখি সৈন্যটা হাঁটু গেড়ে বসে পজিশন নিয়ে নিয়েছে। ইতোমধ্যে আমি রাস্তার বাঁক ঘুরে ফেলেছি। তখন কিন্তু মানুষ মারা কোন ব্যাপারই ছিল না! মৃত্যুভয় সেদিন খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করি।

প্রশ্ন : ২৮) র‍্যাংকিন স্ট্রিটে কত দিন ছিলেন?

উত্তর : ওখানে বেশীদিন থাকা নিরাপদ ছিল না। বিহারী ও উর্দূভাষীদের দাপট বাড়তে লাগলো। সেই সাথে তারা লুঠপাটও শুরু করে দিল। তখন ঢাকার অন্য রূপ। অনেক পুরোনো ঢাকাইয়া উর্দূভাষীদের মত ভাব ধরলো। কিছু কিছু ঢাকাইয়া কুট্টি, যারা কয়েকদিন আগেও জয় বাংলার মিছিলে ছিল, তারাও *"পাকিস্তান জিন্দাবাদ"* শ্লোগান দিতে শুরু করলো। লুটের সুযোগ বেড়ে গেল। হিন্দু অথবা পরিচিত আওয়ামী লীগারদের বাড়ীগুলো লুটেরাদের বিশেষ নজরে পড়লো। সাতাশ তারিখ সকাল থেকে এসব ঘটতে লাগলো। আরেকটি দৃশ্য তখন চোখে পড়তে লাগলো যে লোকজন পালাচ্ছে। খুলনা ছাড়া আমাদের যাওয়ারতো কোন জায়গা ছিল না। ঐ সময় আমার বোনের স্বামীও চাকুরীতে আটকে গেছেন। উনি তখন ঢাকা কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমাকে নিয়েও বোনের চিন্তা, কারণ আমাকে ঘরে আটকিয়ে রাখা যেত না। সুযোগ পেলেই আমি বাড়ীর বাইরে চলে যেতাম। প্রথম দু'তিন দিন ফোন কাজ করতো। খুলনার সাথে ফোনে যোগাযোগ হোত। খুলনায় তখনো নারকীয় কর্মকান্ড শুরু হয়নি। কয়েকদিন পরে ফোনের সংযোগও চলে গেল। টেনশন বাড়তে শুরু হলো। তখন আমরা ধানমন্ডি চলে এলাম, আমাদের পরিচিত একজনের বাড়ীতে। সেই বাড়ীর একটা অংশে আমরা থাকতাম এবং সেখানে আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম।

প্রশ্ন : ২৯) আপনারা তাহলে বাইরের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন?

উত্তর : এক অর্থে। তবে তখন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে *বি বি সি* শুনতাম, *রেডিও অষ্ট্রেলিয়া* শুনতাম। এই রেডিওগুলোই তখন একমাত্র ভরসা ছিলো। *আকাশবাণী* শুনতাম। র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাসায় থাকতেই জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা শুনেছিলাম। সাতাশ তারিখ সন্ধ্যায়। *অন্ বিহাফ অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান....* বক্তৃতাটা আমাদের বেশ উৎসাহ দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমরা ততটা অসহায় নই, বাঙ্গালীদেরও যোদ্ধা আছে।

প্রশ্ন : ৩০) ঢাকায় কত দিন ছিলেন ?

উত্তর : তারপর যখন প্লেন চালু হলো, মা আর কিছুতেই আমাদেরকে ঢাকায় রাখতে রাজী হলেন না। ঢাকা-যশোরের প্রথম ফ্লাইট-টিতে আমার বোন এবং আমাকে খুলনায় পাঠিয়ে দেয়া হোল। ফকার প্লেন। তখন প্লেনে সাব-মেশিনগান নিয়ে দু'জন পাকিস্তানী কমান্ডো থাকতো। একজন সামনে পাইলটের কাছাকাছি বসতো, আরেকজন পিছনে। আমাদের ভ্রমণটা ছিলো খুবই আতংকের। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমরা দু'জনেই কেবল বাঙালি। অন্যরা সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক অথবা উর্দূভাষী। তারা আমাদেরকে বাঁকা চোখে দেখছিল।

প্রশ্ন : ৩১) প্লেনে যশোরে নেমে খুলনায় গেলেন কিভাবে?

উত্তর : যশোর এয়ারপোর্ট তো ছিল ক্যান্টনমেন্টের প্রায় ভিতরেই। যশোর এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম মা একাই এসেছেন ড্রাইভারকে নিয়ে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট তো তখন একটা মহা আতংকিত স্থান! পাকিস্তানী সেনারা চারিদিকে গিজ্ গিজ্ করছিল। মা ঊর্দূ খুব ভালো জানতেন। ফলে আমাদের তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

প্রশ্ন : ৩২) আপনারা যখন খুলনায় গেলেন, তখন কি খুলনা নিরাপদ ছিলো?

উত্তর : খুলনাও নিরাপদ ছিলো না। তবে আমরাতো খুলনায় গেলাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার প্রায় একমাস পরে। ইতোমধ্যে মা'দের কিন্তু অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। শিক্ষকতা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মের কারণে মা খুলনা শহরে একজন পরিচিত মানুষ ছিলেন। তাছাড়া অসাম্প্রাদায়িক নানা কাজের জন্যেও মা'তো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে একটা টার্গেট ছিলেন। মা'য়ের হিন্দু সহকর্মীরা অনেকেই বিভিন্ন সময়ে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টা পাকিস্তান বাহিনীর দোসররা নিশ্চয়ই ভালভাবে নেয়নি! আমাদের পরিবার কিছুদিনের জন্য বাগেরহাটের একটা গ্রামে চলে যায়। প্রথমে কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু পরে ঐ এলাকায় যখন খুনোখুনি শুরু হয়ে যায়, তখন আবার আমাদের পরিবার খুলনায় ফিরে আসে।

প্রশ্ন : ৩৩) একাত্তরের বিশেষ কোন বিষয় আছে কি যা আপনাকে সব সময় কষ্ট দেয়?

উত্তর : একাত্তরের অনেক স্মৃতির মধ্যে যে স্মৃতিটা আমার, এবং মনে হয় বাংলাদেশের অনেক মানুষের মনেই নাড়া দেয়, তা হচ্ছে, অসংখ্য মানুষের কোন কবর হয় নি। লাশের কোন সৎকার হয়নি। সব ধর্মে, সব সংস্কৃতিতে, মৃতদেহের একটা মর্যাদা আছে। শত্রু মারা গেলেও তার মৃতদেহের প্রতি অমর্যাদাকর কিছু করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা রাজাকাররা এতটাই বর্বর ছিল যে, মানুষ মেরে শত শত মানুষের মৃতদেহ তারা নদীর পারে, খালের ধারে, রাস্তার পাশে ফেলে রাখত। আমার অল্প বয়সের অবচেতন মনে সম্ভবত বিষয়টি গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সেই কারণে আমি ***রাবেয়া*** ছবিটির বিষয়বস্তু হিসেবে তেমন একটি কাহিনী উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যেখানে সাহসী বোনটি ভাইয়ের লাশ কবর দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আমার মনে হয়, ১৯৭১-য়ের বাস্তব অবস্থাই এই কাহিনীটির ক্ষেত্রে আমাকে প্রভাবিত করেছিল। যদিও এর মূল থিমটি হচ্ছে গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের *'অ্যান্টিগনে'* নাটকের। যেখানে কাহিনীটা হচ্ছে ভাইটা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মারা যায়। রাজা তখন তার কবর দিতে দেয় না। বোনটি তখন তাকে কবর দিতে যায়। নাটকটি আমি ছাত্রজীবনে একাধিকবার পড়েছি এবং আন্তিগনে চরিত্রটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল।

প্রশ্ন : ৩৪) আপনার প্রথম কাহিনীচিত্র *"নদীর নাম মধুমতী"*-র প্রেক্ষাপটও মুক্তিযুদ্ধ। এই চলচ্চিত্রটিতে আপনি পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন অর্থাৎ একজন পাকিস্তানপন্থী অন্যজন বাংলাদেশপন্থী। এমন পরিবার কি আপনি কাছ থেকে দেখেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, ***"নদীর নাম মধুমতী"***-র মত অনেক পরিবার আমি কাছ থেকে দেখেছি যেখানে ওরকম পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্ব ছিল। বাবা পাকিস্তানপন্থী, ছেলে বাংলাদেশপন্থী, এই দ্বন্দ্বটি ১৯৭১-য়ে কিন্তু এদেশের অনেক ঘরেই ছিল। কারণটা বুঝতে হবে যে পিতাদের প্রজন্ম ১৯৪৭-য়ে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরা তখন বলতেন, *তোমরাতো দেখনি হিন্দুদের অত্যাচার*! ১৯৪৭-য়ে তাঁরা আশা করেছিলেন, পাকিস্তান হলে তাদের অনেক বিকাশ হবে, হয়েও ছিল। মুসলমান

মধ্যবিত্ত সমাজ বেশ উপকৃত হয়েছিল বৈষয়িকভাবে। কিন্তু আমি মনে করি, বৈষয়িকভাবে উপকৃত হলেও নৈতিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই যে, ন্যায্যভাবে অর্জন না করে অপরের সম্পদ দখল করার মানসিকতা আমাদের সমাজজীবনে, এটা পাকিস্তান আন্দোলনের এক কুফল। অনুপার্জিত সম্পদ, যা পরিশ্রম করে নয়, অর্জিত হয়েছে রাজনৈতিক সুবিধার মাধ্যমে– এই মানসিকতা; এটা পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনগণের মানসিকতার মধ্যে থেকেই গেল। এটা কিন্তু শুরু হয়েছিল সেই পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে হিন্দুদের তাড়িয়ে তাদের জমি-বাড়ী দখল করব, তাদের চাকুরী দখল করব, তাদের ব্যবসা দখল করব। এর মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের জাতির নৈতিক অবক্ষয়টা শুরু হয় এবং আজও কিন্তু আমরা এর জন্যে চরম মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। এখনও আমাদের দেশের অনেক মানুষ মনে করে যে আরেকজনের জিনিস দখল করা যায়, অনুপার্জিত সম্পদ ভোগ করা যায়। কোন লজ্জা ছাড়া, কোন অনুতাপ ছাড়াই! এই নৈতিক অবক্ষয়টা হচ্ছে-- পাকিস্তান আন্দোলনের বড় এক কুফল। তাছাড়া পাকিস্তান আমলের যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তা আমাদের কমপক্ষে দুটো প্রজন্মের চিন্তাচেতনাকে খুবই খর্ব ও সীমিত করে ফেলেছিল-- মানবতার প্রশ্নে। যার কুফলও আমরা এখন ভোগ করছি।

প্রশ্ন : ৩৫) এর আগে বাঙালি সংস্কৃতিতে কি লুটপাট বা কেড়ে নেবার মত ঘটনা ঘটেনি?

উত্তর : সব সময়ই কমবেশী ছিল। শাসকদেরতো এরকম একটা ব্যাপার থাকেই। কিন্তু আধুনিক যুগে, যখন রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে গেছে, গণতন্ত্রের একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে, সেই সময় এমন এক পশ্চাৎপদ চেতনা, যে অন্য মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পদ লুট করে নেওয়া যেতে পারে, এটা নিছক একটা মধ্যযুগীয় চেতনাই। এগুলো আধুনিকযুগের কোনো চেতনা নয়। পাকিস্তান ধারণাটাও ছিল একটা মধ্যযুগীয় ধারণা। এর ফলে আমাদের জাতির জীবনে যে আরেকটা বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল, তা হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শিক্ষা চর্চাটা হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশী ছিল। সেরা শিক্ষকেরা তাঁদের মধ্য থেকেই আসতেন এবং শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা অনেক এগিয়ে ছিলেন। এঁদেরকে এদেশ থেকে ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেবার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক শূণ্যতার সৃষ্টি হোল, বিশেষ করে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে। যেসব হিন্দু শিক্ষক চলে গেলেন সেসব চাকুরীতে হয়তো নতুন মুসলমান শিক্ষকেরা এলেন, কিন্তু শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষতিটা হয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সঙ্গীত বলেন, সাহিত্য বলেন, যে অপার শূণ্যতার সৃষ্টি হো'ল সেটা মেধাহীন বা স্বল্প মেধার মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকেরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা পেয়েও, তেমন পূরণ করতে পারেন নি। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা পিছিয়ে গেলাম। আমি মনে করি, '৪৭-য়ের দেশভাগ আমাদের এসব ক্ষতিগুলো করেছে। আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষকে এক নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব ও লুটপাটের মানসিকতা তৈরী করে দিয়েছে। আমরা এখনো এগুলোর জন্যে মূল্য দিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : ৩৬) গত শতাব্দীতে এ ভূ-খন্ডের মানুষের জীবনে যে কয়েকটি গভীর দূর্যোগ নেমে আসে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ, চৌষট্টির দাঙ্গা এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। পরের দুটোতো আপনার জীবনকালেই ঘটেছে, যদিও সেগুলো ঘটেছে আপনার বালক বয়স বা কৈশোর বয়সে এবং যেগুলো আপনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই সময় কি আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি বিষয়গুলো একসময় ভিজ্যুয়ালাইজ করবেন? কারণ আপনার কাহিনীচিত্রে এই বিষয়গুলো বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে।

উত্তর : আমি যখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ি তখনই কিন্তু আমি ভেবেছি যে আমি ***'চিত্রা নদীর পারে'*** নামে একটি ছবি বানাবো। ছোটবেলায় আমার চোখের সামনে যেসব ঘটনাগুলো ঘটে গেছে,

সেগুলো নিয়ে লিখবোও ভেবেছি। খুলনায় আমি বিষয়গুলো কাছ থেকে দেখেছি। খুলনা ছাড়াও নড়াইলের মানুষের জীবনে এমন বিপর্যয় আমি দেখেছি। আমার বাবা তখন নড়াইলের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমাদের পরিবার খুলনায় থাকতো। কিন্তু আমরা ছুটিতে নড়াইলে যেতাম। ঐ দিনগুলো আমার অনাবিল আনন্দে কাটতো। লেখাপড়া নাই, বাবার কাছে থাকছি। ওখানে আর্দালী, পিওন আছে, শিকার করা যাচ্ছে, চিত্রা নদীতে বেড়ানো যাচ্ছে। আশেপাশের প্রায় সবাই হিন্দু ছিলেন। আমার বয়সী হিন্দু ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতাম। একই সাথে তাদের এই বেদনাটাও বুঝতে পারতাম যে তারা চলে যাবে, থাকবে না। বাড়ীর সামনে এক উকিল ছিলেন। উনি প্রায় বাবার কাছে বেড়াতে আসতেন। ঠিক ***চিত্রা নদীর পারে***-র শশী উকিলের মত। তিনি বাবাকে বলতেন, *মোকাম্মেল সাহেব, এত সুন্দর সোনার দেশ ছেড়ে কোনদিন যাব না।* তাঁর মেয়ে আমার বোনদের বান্ধবী ছিল। ওরা একসাথে খেলাধুলা করতো। এ ধরণের পরিবার আমি চারপাশে দেখেছি। পরে পরিবারটি নড়াইল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং শুনেছি পরবর্তী জীবন তাঁদের খুব দুঃখ কষ্টে কেটেছে। ***চিত্রা নদীর পারে*** ছবিতে আমি নড়াইলকে তুলে আনবো ভেবেছিলাম। ছবিটিতে শশী উকিলের যে বাড়ীটা দেখেছেন, আমি আশা করিনি যে অমন একটা বাড়ী আমি চিত্রা নদীর পারেই চট্ করে খুঁজে পাবো। কাহিনীর সাথে সংগতি রেখে অমন একটি বাড়ী আমি বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই তখন খুঁজেছিলাম। কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ– অনেক জায়গাতেই অমন একটি বাড়ী খুঁজেছিলাম। যার পাশে নদী আছে এবং বাড়ীটি দেখলেই যেন মনে হয় যে বাড়ীটি একটি হিন্দু পরিবারের বাড়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত আমাকে নড়াইলেই যেতে হোল এবং সেখানেই এমন একটা বাড়ী আমি খুঁজে পেলাম! বাড়ীটিতে তখন এক মুসলিম পরিবার থাকতো। স্যুটিং চলার সময় আমার কৌতুহল হোল, যে বাড়ীটায় স্যুটিং করছি, সেই বাড়ীটা আসলে কার ছিল। এক বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সেটা এক হিন্দু উকিলের বাড়ী ছিল। যখন জানতে চাইলাম মানুষটা কেমন ছিল? তখন সে আমাকে বললো, *আর বলবেন না, সে এক পাগল লোক ছিল, যখন সবাই চলে যাচ্ছে, সে যাবে না*! বয়স্ক ব্যক্তিটির কথা শুনে আমার মেরুদন্ডে এক শির্ শির্ অনুভূতি হোল! আমাদের ছবির কাহিনীর সাথে স্যুটিং-এর লোকেশনের বাড়ীটার কাহিনীটাও দেখলাম এক!!

আর মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আমি সবসময়ই ভেবেছি চারপাশে যা ঘটতে দেখেছি সেসব নিয়ে একদিন লিখব, ছবি তৈরী করব। যার ফলশ্রুতি বলতে পারেন ***'নদীর নাম মধুমতী'***, ***'নিঃসঙ্গ সারথি'*** কিম্বা ***'রাবেয়া'***।

প্রশ্ন : ৩৭) ***নদীর নাম মধুমতী*****-র কাহিনীটি চমৎকার। কিন্তু অ্যাক্শন দৃশ্যগুলি আরো যথার্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কি?**

উত্তর : ***নদীর নাম মধুমতী***-র কাহিনীটি ভালো হলেও ছবিটা আমরা যথাযথভাবে বানাতে পারিনি। কারণ তখন ছবিটি বানানোর মত কোনো টাকাপয়সাই আমাদের ছিল না। তাছাড়া ছবিতে যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রও আমাদের কিছুই ছিল না। সেনাবাহিনীর কাছে আমরা চেয়েছি, তারা দেয়নি। *বাংলাদেশ রাইফেলস্*-য়ের কাছে চেয়েছি, তারাও দেয়নি। ফলে অ্যাকশন দিকগুলি খুবই দূর্বল থেকে গেছে।

আসলে এসব ছবির গুরুত্ব হচ্ছে, যে সময়ে ছবিটা তৈরী হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এদেশে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলাই যেতই না, ছবি বানানো তো দূর অস্থস্ত! সেরকম এক প্রতিকুল রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে আমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ***'নদীর নাম মধুমতী'***-র মতো একটা ছবি তৈরীর চেষ্টা করেছিলাম। মনে রাখতে হবে ১৯৭৫-য়ের পর ওটাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম কাহিনীচিত্র। এবং সরকার ছবিটা নিষিদ্ধ করেছিল। ছবিটার মুক্তির জন্যে আমাদেরকে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৩৮) *লালসালু*-র মাধ্যমে আপনি এদেশের একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীদের চপেটাঘাত করেছেন। ছবিটি নির্মাণের চিন্তা আসল কিভাবে?

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র ওপরে আমি একটি বই লিখেছিলাম। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বই। বইটির নাম *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা*। বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে *লালসালু* বহুবার পড়তে হয়েছে। হয়তো বিশবার পড়তে হয়েছে। তখন আমার মনে হয়েছে *'লালসালু'* উপন্যাসটির মধ্যে চলচ্চিত্রিক অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দেশে তখন ইসলামী মৌলবাদ খুব বাড়তে শুরু করেছিল। এর বিরুদ্ধে আমার কিছু করণীয় আছে বলে মনে হয়েছিল। ফলে আমি ***লালসালু*** ছবিটি নির্মাণে সিদ্ধান্ত নিই।

প্রশ্ন : ৩৯) *লালন* বানাতে আগ্রহী হলেন কেন?

উত্তর : লালন ফকিরকে নিয়ে আমার সবসময়ই একটা আগ্রহ ছিল। বাউলদের গান আমাকে খুবই আকৃষ্ট করত। প্রায় বারো বছর আগে আমি লালন ফকিরকে নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছিলাম-- ***অচিন পাখি***। এটা করার সময় আমার মনে হয়েছিল, লালন ফকির যে রকম বড় মাপের শিল্পী তাঁকে নিয়ে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র করা উচিৎ। এর মধ্যে অনেক বাউলের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে। যেমন মহিন শাহ্‌কে চিনেছি। তাঁর সাথে আমি পদ্মার চরে চরে অনেক ঘুরেছি। এর পরেই আমি ***'লালন'*** ছবিটি করার উদ্যোগ নিই।

প্রশ্ন : ৪০) স্যুটিং স্পটে এমন কিছু ঘটনা কি আপনার অভিজ্ঞতায় ঘটেছে যা সিনেমার কাহিনী এবং বাস্তবজীবনের কাহিনীকে একাকার করে দেয়?

উত্তর : ***লালসালু*** নিয়ে একটি ঘটনা বলি। টাঙ্গাইলের একটা গ্রামে আমরা স্যুটিং করেছিলাম। গ্রামের বাঁশঝাড়ের মধ্যে মাজারটি বানানো হয়েছিল। মাজারের পাশে একটি দানবাক্স লাগানো হয়েছে যেমনটি সব মাজারের পাশেই থাকে। স্যুটিং চলছে, একদিন অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ আমার আগে স্যুটিং স্পটে গেছেন। আমি স্পটে পৌঁছাতেই দেখি আসাদ হাসছেন। কারণ জানতে চাইলে উনি পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা পয়সা বের করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনি কৌতুহলবশে দান বাক্সটা খুলেছিলেন এবং খুলে দেখতে পেয়েছেন কারা যেন দানবাক্সের ভেতরে সত্যিকারের টাকাপয়সা রেখে দিয়ে গেছে! গ্রামের লোকেরা দেখেছে যে আমরা একটা কৃত্রিম মাজার বানিয়েছি, অনেক লাইট, ক্রেন এসব আছে, নিয়মিত শুটিং হচ্ছে। কিন্তু কোন অসহায় মা হয়তো ভেবেছে, এরকম লাল সালু কাপড়ে ঢাকা তকতকে মাজার, লাল সামিয়ানা টানানো আছে, এখানে কিছু পয়সা দিলে হয়তো তার অসুস্থ বাচ্চা ভালো হবে বা কারো কোন উপকার হবে! আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার যে দূরবস্থা, ফলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত কোনো সুবিধা-না-পাওয়া গরীব অসুস্থ মানুষেরা আসলে যাবেটা কোথায়! এধরণের মাজারই তাদের ভরসা। মানুষ খুব বেশী অসহায় হলেই তো অদৃষ্টবাদী হয়। ফলে এখনো মজিদদের ব্যবসা, মাজারের ব্যবসা, বাংলাদেশে তাই খুব ভালোই চলছে! ***'লালসালু'***-র যুগের মতোই।

প্রতিটি ছবিতেই স্পটে গিয়ে আমি কিছু শিখি। ***লালন*** ছবি তৈরীর সময়কার একটা কাহিনী বলি। ***লালন*** ছবির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় ছত্রিশ জন সত্যিকারের বাউল-ফকির ছবিটিতে অভিনয় করেছিল। বাস্তবজীবনেই তারা বাউল ও ফকির। খুব সহজ-সরল মানুষ তারা। বাস্তব জীবন ও স্যুটিং জীবন যে তাদের মনোজগতে কেমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল ***লালন*** ছবির স্যুটিং-য়ের সময় আমি তা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করি। শেষের দিকে বাউলেরা লালনের চরিত্রে অভিনয়কারী আসাদকে তাদের সত্যিকারের লালন সাঁইজী বলে মনে করা শুরু করে। আসাদের দাড়ি ঝুঁটির গেট-আপ, মেক-আপ আর লালনসূলভ সংলাপে তারা হয়তো

আসাদের মধ্যেই তাদের প্রিয় লালন সাঁইজীর রূপটা দেখছিল। শেষ দৃশ্যে, অর্থাৎ লালন যখন মারা যাবে, রাতের বেলা, করুণ একটি গান হচ্ছে, স্যুটিং চলছে, বাউলেরা হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল! তারা ভাবছিল, তাদের প্রিয় লালন সাঁইজী বোধহয় সত্যিই সত্যিই তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! এদিকে স্যুটিং তো চলছে। আমরা নীরব, গুরুগম্ভীর পরিবেশ। ওদিকে তারা সত্যিকারভাবেই কেঁদে চলেছে। বাস্তবতা আর সিনেমা তাদের জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছিল! আবারো বুঝলাম তারা তাদের সাঁইজী লালনকে কত গভীরভাবে ভালবাসে!

প্রশ্ন : ৪১) আপনি বলেছেন যে কৈশোর জীবনে মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি দেখেছেন অনেক লাশের কবর বা দাহ হয়নি। *রাবেয়া* ছবিটি কি ঐ দুঃসহ স্মৃতি থেকেই বানালেন?

উত্তর : হ্যাঁ। আগেই বলেছি ***রাবেয়া***-র কাহিনীটা আমাকে অনেকদিন তাড়িত করতো। একাত্তরে অসংখ্য, অগণন লাশেরই কবর হয়নি। ছাত্রজীবনে সফোক্লিসের *'আন্তিগনে'* নাটকটি পড়েছিলাম। সেটা অবলম্বনে আমি একটি নাটক লিখেছিলাম *'একাত্তরের আন্তিগনে'* নামে। নাটকটি আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের পড়িয়েছি। অনেকেই পছন্দ করেছে। তারপর মনে হল মঞ্চনাটক করলে তো সীমিত মানুষের কাছে পৌঁছবে, হয়তো অনেকের কাছেই পৌঁছবে না। আর যেহেতু আমি সিনেমা বানাই, ফলে এটা নিয়ে ছবি তৈরী করলেই ভালো হবে। এখন ফিল্ম বানাতে তো অর্থ লাগে! বাংলাদেশ সরকার এ ছবিটা বানানোর জন্য আমাকে অনুদান দিয়েছিলেন। এই-ই প্রথম, হয়তোবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলেই, এটা সম্ভব হয়েছে। কারণ এর আগে ***'চিত্রা নদীর পারে', 'লালসালু'*** বা ***'লালন'***-য়ের মত চিত্রনাট্যের জন্যেও আমি অনুদান পাই নি।

প্রশ্ন : ৪২) কিন্তু *'চিত্রা নদীর পারে'* বা *'লালসালু'* ছবি দুটোর জন্য আপনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তো পেয়েছেন?

উত্তর : বেশ কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু অনুদান তো পাইনি। ***রাবেয়া*** ছবির জন্য সরকার এই-ই প্রথম আমাকে অনুদান দিল। খুশি হয়েছি আমি। আসলে পুরস্কার তো কোন বড় ব্যাপার না। পুরস্কার দিয়ে কিছু প্রমাণিত হয় না, অপ্রমাণিতও হয় না। ঋত্বিক ঘটকের ছবি কখনো কোথাও পুরস্কার পায়নি। তাতে ঋত্বিক ঘটকের কিছুই আসে যায়নি। আসলে দেখতে হবে, শিল্প সৃষ্টি হোল কি না। শিল্প সৃষ্টি হলেই সেটা বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। আর শিল্প না হলে পঞ্চাশটা পুরস্কারও কোনো চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ভ্যান গগও জীবদ্দশায় কোনো পুরস্কার পাননি। আমার বেড রুমে আমি শুধু এই দু'জন শিল্পীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছি-- ঋত্বিক ঘটক ও ভ্যান গগ। আমার প্রিয় দুই শিল্পী।

প্রশ্ন : ৪৩) আপনি তো অনেকগুলি সফল প্রামাণ্যচিত্রও করেছেন?

উত্তর : প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করতে আমার ভালো লাগে। বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন উঠে আসে প্রামাণ্যচিত্রে। আমি চেষ্টা করি একটি কাহিনীচিত্র তৈরীর পর একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করতে। কারণ হচ্ছে, যদিও আমার কাহিনী চলচ্চিত্রগুলো সবই বাস্তবধর্মী, কিন্তু আমিতো জানি, কাহিনীটা আমি লিখেছি, চরিত্রগুলো আমি তৈরী করেছি। কেউ অভিনয় করছে, পোশাক বানানো হয়েছে, সেট বানানো হয়েছে। ফলে কৃত্রিমতা একটা রয়েই যায়! আমি মনে করি, একজন চলচ্চিত্রকারের জন্য বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা খুবই জরুরী। প্রামাণ্যচিত্র বানাতে গেলে আমাদের দেশের প্রকৃত মানুষ, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বাস্তবতার জগতে আমাকে আবার ফিরে আসতে হয়। এটা খুবই জরুরী। আমার মনে হয়, একজন শিল্পীর

সৃজনশীলতার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি তাঁর স্বদেশের মাটিতে, স্বকালে, *দৃঢ়ভাবে* দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন।

প্রশ্ন : ৪৪) আপনার প্রথম প্রামাণ্যচিত্র *স্মৃতি-৭১* তো এখনো দর্শকের কাছে পৌঁছল না?

উত্তর : ওটা আমার জন্য বেদনাদায়ক একটি অধ্যায়। শুধু আমার জন্য নয়, ছবিটিতে যাঁদের সাক্ষাৎকার রয়েছে সেইসব শহীদদের বিধবাদের জন্যও। বাংলা একাডেমী থেকে তখন চার খন্ডে *'স্মৃতি-৭১'* নামে বইগুলি বেরিয়েছিল। শহীদ পরিবারদের নিকটজন অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্মৃতিচারণ ছিল বইগুলির বিষয়বস্তু। আমি যে প্রামাণ্যচিত্রটি করি ওটা মূলত: ছিল সাক্ষাৎকারমূলক। কিভাবে তারা তাদের প্রিয়জনদের হারালেন, যারা ধরে নিতে এসেছিল সেই আল-বদরের সদস্যরা কেমন ছিল, কীভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়, ইত্যাদি। ছবিটি আহামরি কিছু না। তবে সাক্ষাৎকারগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক অজানা বিষয়ে তাঁরা বলেছেন। যেমন, আলীম চৌধুরীকে হত্যার পিছনে মওলানা মান্নানের ভূমিকা কি ছিল? সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কী ভূমিকা রয়েছে রাউজানের নতুনচন্দ্র সেনকে হত্যার ব্যাপারে, এগুলি তাঁরা বলেছেন এবং এসব কারণেই ছবিটা সরকার দেখাতে দিতে চান না। আমার একটা ভুল ছিল যে, ছবিটির মালিক আমি নই, মালিক বাংলাদেশ সরকার। ভুলটা কাগজপত্রে হয়েছে। কারণ ছবিটা নির্মাণে আমার নিজেরও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সরকারী প্রতিষ্ঠান 'নিমকো' (NIMCO)-র অধীনে ছবিটি হয়েছিল, ফলে ব্যাপারটা ওকরম ঘটতে পেরেছে । তখন আমার বয়স কম ছিল, অভিজ্ঞতাও কম ছিল। আসলে ছবিটির যে মালিক সেই সরকারই যদি ছবিটা দেখাতে না চায় আমার করার তেমন কিছু থাকে না। ***'স্মৃতি '৭১'***-য়ের ব্যাপারে আমি আইনী বেড়াজালে আটকে গেছি। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! আমি এখন মনে করি, নিজের সৃষ্টির উপর অধিকার একজন শিল্পীর মৌলিক এক অধিকার। এখন আমি আর কোন ছবি তৈরী করব না, যেটাতে আমার মালিকানা স্বত্ব নেই অর্থাৎ আমি চাইলেই দর্শককে দেখাতে পারবো না। আমি একজন ইন্‌ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার অর্থাৎ স্বাধীন ফিল্ম মেকার এবং সত্যিকার অর্থেই একজন স্বাধীন ফিল্ম মেকার হিসেবে আমি থাকতে চাই। বর্তমানে আমার যে কোনো ছবিই আমি যেখানে খুশী দেখাতে পারি।

প্রশ্ন : ৪৫) আপনি নিজেকে ইনডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার বলছেন। এই ইনডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিং-য়ের ধারণাটা কবে এবং কিভাবে আপনার মধ্যে দানা বাঁধল?

উত্তর : আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলাম। আমরা পত্রিকা বের করতাম এবং এক সময় একটি ফিল্ম সোসাইটি তৈরী করি। *ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিনে সেন্টারে* আমি ছাড়াও ছিলেন আমার বন্ধু মানজারে হাসিন মুরাদ, ম. হামিদ ও আরো অনেকে। সত্তর দশকে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমরা ফিল্ম সোসাইটিটির কাজকর্ম করতাম। এসব করতে গিয়ে তখন প্রচুর ফিল্ম দেখতাম, ফিল্ম নিয়ে লিখতাম, সেমিনার-ওয়ার্কশপের আয়োজন করতাম। নিজেরা চলচ্চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতাম। একসময় আমার মনে হল যে, কেবল অন্যদের ছবি না দেখিয়ে নিজেরা ছবি তৈরী করতে বেশী পারলে ভালো হবে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে একটি কোর্স হয়। ঐ কোর্সে আমাদেরকে *হুলিয়া* ছবির চিত্রনাট্য লিখতে বলা হয়েছিল। আমাদের প্রশিক্ষক সালাউদ্দিন জাকি আমার চিত্রনাট্যটির বেশ প্রশংসা করেছিলেন। আমি তখন **'হুলিয়া'** চিত্রনাট্যটি নিয়ে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি বানানোর উদ্যোগ নিই। মা'কে বললাম। মা কষ্ট করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমাদের পরিবারের মর্যাদা হয়তো ছিল, কিন্তু নগদ টাকাপয়সা আমাদের কোনোকালেই ছিল না। বাবা সরকারী চাকুরীজীবি ছিলেন এবং সৎ অফিসার ছিলেন। ফলে বাড়তি কোন টাকা আমাদের থাকত না। মা'র অর্থও ছিল চাকুরীর অর্থ। খুব স্বল্প অর্থ দিয়েই ছবিটি আমি শুরু করেছিলাম। **'হুলিয়া'** ছবিটি নির্মাণে আমার বন্ধু মানজারে হাসিন মুরাদ আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। **'হুলিয়া'** ছবিটির ক্ষেত্রে মুরাদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। চিত্রগ্রাহক আনোয়ার

হোসেন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিয়েছিলেন। অন্যরাও। তবে ছবিটি যেভাবে আমি বানাতে চেয়েছিলাম সেভাবে হয়নি। কিন্তু জনগণ তবুও ছবিটি পছন্দ করেছিল এবং দলে দলে দেখতে এসেছিল। ***'হুলিয়া'*** ছবি তৈরীর আগে থেকেই আমার মনে বাংলাদেশে বিকল্পভাবে ছবি তৈরী ও তা প্রদর্শনের সম্ভাবনার চিন্তাটা ছিল। সে সময় আরেকটি ভালো শর্ট ফিল্ম তৈরী হয়েছিল, মোর্শেদুল ইসলামের ***আগামী***। দুটো ছবি একসাথে দেখানো হোত। ফলে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের ধারণাটি মানুষের মধ্যে এল। ধারণাটিকে আমরা আস্তে আস্তে জনপ্রিয় করলাম। আমাদেরকে বড় দৈর্ঘ্যের ছবি করতে হবে এ চিন্তাটাও আমার বরাবরই ছিল। তখন আমরা আমাদের এই শব্দটাকে পাল্টিয়ে বললাম *বিকল্প ধারার ছবি*। দৈর্ঘ্যটা মূখ্য না। ছবি কিভাবে তৈরী হচ্ছে এবং কিভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে সেটাই বড় কথা। এখন এই শব্দটা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে-- বিকল্প চলচ্চিত্র। একজন ঔপন্যাসিককে যেমন বলা হয় না তাকে দুই'শ পৃষ্ঠারই উপন্যাস লিখতে হবে, অথবা একজন কবিকে যেমন বলা হয় না যে তাঁকে কুড়ি লাইনেরই কবিতা লিখতে হবে, তেমনি আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি যে, একটি ফিল্মকে আড়াই ঘন্টারই হতে হবে এটা কোনো কথা নয়। হলিউড এটা করেছিল তাদের ব্যবসার জন্য। এটা সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক এক উদ্দেশ্যে করা, এর সাথে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই। একটা ফিল্মের চিত্রনাট্য যে দৈর্ঘ্যের, ছবিটির দৈর্ঘ্যও ততটুকুই। এবং সেটাই সে ছবির জন্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য। সেটা দশ মিনিটের হতে পারে আবার পাঁচ ঘন্টারও হতে পারে। প্রায় ছয় ঘন্টার ছবিওতো আছে *ওয়ার এন্ড পিস,* আবার এক মিনিটের ছবিও আছে-- নরমান ম্যাকলারেনের। অসাধারণ সব ছবি! মুক্ত দৈর্ঘ্যের যে অন্বেষা, এটা আমার কাছে শিল্পীর স্বাধীনতার অন্বেষা। যে মুহূর্তে আপনি দৈর্ঘ্যের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, তখনই আপনি অনেক দিক থেকেই স্বাধীন হয়ে গেলেন। আরেকটি বিষয় ছিল-- চলচ্চিত্র নির্মাণের ফর্মাট। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে প্রথাগত ৩৫ মি.মি.-য়ে ছবি না বানিয়ে আমরা ১৬ মি.মি.-য়ে আমাদের সেসময়কার ছবিগুলি বানিয়েছিলাম। এটা আমি সচেতনভাবেই করেছিলাম। কেতাবী ভাষায় বললে *"উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তন এনে উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটানো"*! ১৬ মি.মি.-য়ে ছবি বানানোর কারণে ছবির খরচ অনেক কমে গেল। ফলে আমরা নিজেরাই ছবির মালিক হতে পারলাম। বাণিজ্যিক প্রযোজকদের দ্বারস্থ আর হতে হোল না। তাছাড়া ১৬ মি.মি. প্রজেক্টর সহজলভ্য বিধায় আমরা যেখানে সেখানে আমাদের ছবিগুলি দেখাতে পারতাম। আমরা সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন চলচ্চিত্র-নির্মাতা হতে পারলাম। ফিল্ম সোসাইটি করার আরেকটি অভিজ্ঞতা আমি পরবর্তীতে কাজে লাগিয়েছি। আমাদেরকে ছবি দেখাতে বিদেশী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে যেতে হোত। কিন্তু অনেক সময়ই তাঁরা ছবি দেখানোর জন্য আমাদের চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের মিলনায়তন দিতেন না। হয়তো ওঁদের অন্য কর্মসূচী থাকতো, অথবা অন্য কোন কারণে। ফলে আমাদেরকে প্রায়ই হতাশ হতে হো'ত। তখন আমার মনে হোত, স্বাধীন একটা দেশ আমাদের, কিন্তু আমরা ছবি দেখানোর কোনো জায়গা পাচ্ছি না। আমাদের নিজস্ব একটা ফিল্ম সেন্টার থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের এমন সমস্যায় পড়তে হোত না। তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম কখনো সুযোগ পেলে আমাদের নিজস্ব একটি ফিল্ম সেন্টার তৈরী করবো। পরবর্তীকালে আমি লন্ডনে গেছি। ওখানে *ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট* দেখেছি, *ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার* দেখেছি। এই যে ধারণাটা যে, যে কেউ সদস্য হয়ে, সপ্তাহে একদিন ভালো ছবি দেখতে পারবে, বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিতে পারবে, এই বিষয়টা আমি আরো জানতে-বুঝতে চেয়েছিলাম। বিদেশের আরো কিছু ফিল্ম ইনস্টিটিউট দেখার পর, যখন আমাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হয়েছে, যদিও আমাদের আর্থিক অবস্থা কখনোই ভালো থাকে না(!), ছোট করে হলেও ঢাকায় আমরা একটা *ফিল্ম সেন্টার* বানিয়েছি। স্বল্পপরিসরে হলেও এটা কাজ করছে। *ফিল্ম সেন্টারটিতে* নিয়মিত দেশ-বিদেশের ধ্রুপদ ছবি দেখানো হয়ে থাকে। আর চলচ্চিত্র বিষয়ক নানারকম কোর্স পরিচালিত হয়। আমি সবসময়ই বিশ্বাস করেছি যে নিজস্ব কিছু থাকতে হবে। বিদেশীদের উপর বেশী নির্ভরশীল হলে চলবে না।

প্রশ্ন : ৪৬) বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোন্ রাজনৈতিক ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। তবে আমার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ছিল। আমি প্রথমে যত না ছাত্র ইউনিয়ন করেছি তার চেয়ে বেশি কমিউস্টি পার্টি করেছি। আমার একসময় মনে হয়েছে, দেশে সমাজতন্ত্র জরুরী। বিশেষ করে তিয়াত্তরের শেষের দিকে এবং চুয়াত্তরে, যখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, দেশে দূর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। আমি দেখেছি, ফুটপাতে মানুষ মরে পড়ে আছে। আমরা আউটার স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলতাম। দেখতাম, গ্রাম থেকে দলে দলে বুভূক্ষ মানুষ সেখানে আসছে। অসুস্থ হয়ে মরে পড়ে থাকছে। একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ! তখন আমার মনে হয়েছে, দেশের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে কমিউনিজমই সমাধান। সব ছাত্র-তরুণেরাই তখন বামপন্থী ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন তখন বিশাল একটা সংগঠন। আমি গাড়ী চালিয়ে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে চলে গিয়েছিলাম যে, আমি কমিউনিস্ট হতে চাই! রোমান্টিকতাও হয়তো ছিল ঐ বয়সে। আমাকে বলা হোল *কমিউনিস্ট হবার তো কিছু নিয়ম-নীতি আছে। আপনাকে প্রথমে কোন গণসংগঠনে কাজ করতে হবে* এবং বলা হোল ছাত্র ইউনিয়ন করতে। তাঁরা আমাকে ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক ইউনিটে কাজ করতে বলেন। আমাদের কাজ ছিল নেপথ্যে। আমরা যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিয়োজিত, আমরা নেপথ্যে থেকেই কাজ করতাম। ফলে ঐভাবেই আমরা কাজ করতে অভ্যস্থ হয়েছি। অন্যদেরকে সামনে রেখে। আমরা যখন শর্ট ফিল্ম ফোরাম বা বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছি, তখনো দেখবেন যে, আমরা সামনে তেমন নেই।

আজ বুঝতে পারি ছাত্র ইউনিয়ন একটি সত্যিকারের একটা আদর্শ ছাত্রসংগঠন ছিল, অসাধারণ। যেখান থেকে আদর্শ মানুষ তৈরী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সাংগঠনিকভাবে দক্ষ হওয়া, কোন কাজ সুচারুভাবে করা, নিজে সব কৃতিত্ব না নিতে চাওয়া, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারা, এগুলো যদি আমি কোথাও থেকে শিখে থাকি, সেটা ছাত্র ইউনিয়ন থেকে। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে আমি অসাধারণ কিছু মানুষের দেখা পেয়েছি। যাঁরা এই মাটিতে জন্মেছিলেন এবং এই দেশেই ছিলেন ভাবলেই আমার গর্ব হয়। আমি রণেশ দাশগুপ্তের মত মানুষের সাহচর্য পেয়েছি। সত্যেন সেনকে দেখেছি। বলতে পারেন দেবতূল্য মানুষ সব। আমি জ্ঞান চক্রবর্তীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। খুলনার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। সেখানে আমি রতন সেনের মত মানুষকে পেয়েছি। তাদের সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। ফলে একজন মানুষ যে তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহিমায় কত বড় মাপের হতে পারে, এঁদের দেখে শিখেছি। সেজন্য আমি মানুষের ব্যাপারে কখনো হতাশ হই না। আমরা আমাদের চারপাশে অসংখ্য আজেবাজে রাজনৈতিক নেতা দেখি, কিন্তু এই মাটি ওঁদের মত অসামান্য মানুষদেরও তো জন্ম দিয়েছিল! যদিও তাদের অনেকেরই জীবন সুখকর হয় নি। অনেকেই কষ্ট পেয়েছেন, অনেকেই বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বছর জেল খেটেছেন! তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি বলেই অর্থ-যশ ছাড়াই কাজ করে যেতে আমার কখনো আপত্তি থাকে না। এই প্রশিক্ষণটা আমি কমিউনিস্ট পার্টি থেকেই পেয়েছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাকালীন প্রথম দিকে আমাকে তাত্ত্বিক বিষয় বা লেখালেখি নিয়ে থাকতে হোত। *একতা* পত্রিকায় কাজ করতাম। ভালোই লাগতো। তরুণ সাংবাদিক হিসেবে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, লিখছি। তখন দেশটাকে জেনেছি অনেক গভীরভাবে।

প্রশ্ন : ৪৭) আপনি যখন একনিষ্ঠভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত তখনই কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো ধ্বসে পড়ছে। আপনি যেহেতু তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কাজ করতেন ফলে আপনি কি কমিউনিজমের এই পতন সম্পর্কে অনুমান করতে পেরেছিলেন?

উত্তর : বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টদের একটি বিখ্যাত তাত্ত্বিক পত্রিকা ছিল *ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ*। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ থেকে বেরুত। ওটার বাংলা সংস্করণ *মুক্তির দিগন্ত*-তে আমাকে কাজ করতে হোত। সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে *'প্রথম আলো'* পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান।

"মুক্তির দিগন্ত"-তে আমাকে অনেক কাজ করতে হত। অনুবাদ করা, অন্যদেরকে দিয়ে অনুবাদ করানো, প্রুফ দেখা, সম্পাদনা ইত্যাদি কাজ। কমিউনিস্ট পার্টি করার ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক পড়াশুনা আমার আগেই ছিল, তবে *'মুক্তির দিগন্তে'*-তে কাজ করার ফলে আমাকে মার্কসবাদের বেশ গভীরে যেয়েই পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ওখানে যাঁরা লিখতেন তাঁরা দুনিয়ার সেরা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বা পার্টির নেতা। সুতরাং তাঁদের লেখা পড়া, অনুবাদ করা, নিজে বোঝার চেষ্টা করা। পরিবর্তনগুলো যে হচ্ছে, মার্কসবাদের প্রয়োগিক সংকটটা কোথায়, পেরেস্ত্রইকা কেন দরকার, কেন সংস্কার দরকার, কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর গঠনের ভেতরে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে–এগুলো আমার কাছে ক্রমশ: পরিস্কার হয়ে উঠছিল। ফলে যখন সংকট এল, তখন অনেকেই হতবাক হলেও আমি ততটা হইনি। কারণ আমি আগে থেকেই, কিছুটা হলেও বুঝতে পারছিলাম যে একটা সংকট আসছে। আরেকটা ব্যাপার ছিল, আমাদের যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, তাঁরা পুরোপুরি সোভিয়েতনির্ভর ছিলেন। তাঁদের পঠনপাঠন বা বিদেশ যাওয়া ঐ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরেই। তাঁরা কেবল একটা পক্ষ দেখেছেন। তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের টিকিটেই সে দেশে যেতেন ফলে তাঁরা শুধু সে দেশের সাফল্যগাঁথাগুলোই দেখেছেন। কিন্তু অন্য দিকে যে অনেক ক্লেদ জমা হয়েছে, সেগুলো তাঁরা তেমন দেখতে পেতেন না। এমনকি আমাদের পার্টির নেতারাও। তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। কিন্তু ওঁদের সফরগুলো তো হোত গাইডেড্ ট্যুর। আমি যখন পোলান্ডে গেলাম.....

প্রশ্ন : ৪৮) কত সালে?

উত্তর : *সেভেনটি নাইনের* দিকে। নিজের টাকায় টিকিট কেটে গেছি। আমি যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির টিকিটে যাই নি, একজন ফিল্ম মেকার হিসেবে নিজের খরচে স্বাধীনভাবে গিয়েছি, ফলে পোলান্ডের সাধারণ মানুষদের সাথে স্বাধীনভাবে মিশতে পেরেছিলাম। আমি তখন দেখলাম ওখানকার সাধারণ মানুষেরা কমিউনিস্ট পার্টিকে কী চোখে দেখে। দেখলাম, অনেক সমস্যা আছে। কমিউনিস্ট পার্টিকে দেখা হয় গণতন্ত্রহীন এক পার্টি হিসেবে। পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পরিবেশও তখন গণতন্ত্রহীন দমবন্ধ এক পরিবেশ। এতদিন আমি অন্য দিকটাতে ছিলাম। আমি নিজেই কমিউনিস্ট পার্টির একজন ছোট নেতা বা ভাল কর্মী ছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম সাধারণ জনগণের কাছে সোভিয়েত পার্টির অবস্থানের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং পোলান্ডের পার্টির মধ্যেও অনেক সমস্যা।

প্রশ্ন : ৪৯) সেই সময় ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্য দেশে কি গিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেও গিয়েছিলাম। প্রচুর ইংরেজী সাহিত্য পড়ার ফলে পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষ ও জীবন সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছিল। পশ্চিম ইউরোপে গিয়ে আমি বাস্তবে দেখতে পেলাম যে পশ্চিমা গণতন্ত্রের বেশকিছু ভাল দিক আছে। আমরা যেরকমটা বলতাম যে পশ্চিমা গণতন্ত্র মানেই অবক্ষয়, এটা টিঁকবে না, সে রকম কিন্তু নয়। ধনতন্ত্রের তো এমনিতে অনেক সমস্যা আছে। এটাতো অমানবিক একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু এটাতো একদিনে সৃষ্টি হয়নি। পাঁচশ বছর ধরে ধনতন্ত্র টিঁকে রয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। ফলে এর ভিতরেও কিছু সংস্কার হয়েছে। বিশেষ করে যেসব দেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ধারাতে গেছে। যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, সুইডেন, ডেনমার্ক এসব দেশে গিয়ে আমি তো তেমন কোন সমস্যা দেখলাম না। দেখলাম যে, রাষ্ট্র খুবই দায়িত্বশীল। রাষ্ট্র নাগরিকের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেখে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, চাকুরী অর্থাৎ জীবনে মৌলিক যা যা প্রয়োজন। আবার ব্যক্তিনাগরিক চরম স্বাধীন। তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। মনে হোল, এটাইতো আদর্শ। একদিকে রাষ্ট্র আমার কোন ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে না, আমার অপার স্বাধীনতা রয়েছে। অথচ আবার আমার দূর্দিনে রাষ্ট্র আমার পাশেই রয়েছে। এটাইতো আদর্শ অবস্থা হওয়া উচিৎ।

পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র দূর্দিনে নাগরিকদের পাশে থাকে বটে কিন্তু আবার নাগরিকদের স্বাধীনতা তো নেই।

প্রশ্ন : ৫০) এসব দেখে আপনার চিন্তা-চেতনার কি মোড় ঘুরছিল?

উত্তর : বেশ কিছুটা। তবে চিন্তা-চেতনার মোড় ঘোরা তো একদিনে হয় না। বরং দীর্ঘদিনের পঠন এবং উপলব্ধির ফলে হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ পড়ছি, ওঁর *'রাশিয়ার চিঠি'* পড়ছি। উনি যে বলেছেন মানুষ ছাঁচের মধ্যে থাকবে না, মানুষ মানুষ বলেই ছাঁচ ভেঙ্গে ফেলবে। ঠিক তাই-ই হোল। মানুষতো বহু বৈচিত্র্যময় প্রাণী। মানুষের জীবনে অনেক দিক আছে। শুধু রুটি ও ভাতের জন্যই যদি মানুষ বেঁচে থাকত, তা হলেতো মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। মানুষের জীবনে সংবেদনশীল অনেক দিক আছে। যেগুলো কমিউনিস্ট পার্টির দেবার মত অবস্থা নেই। তাদের যে মূল ধারণা, একদলীয় শাসন, একটা শ্রেণীর শাসন, মানবাধিকারের প্রশ্নে সেটা আমার কাছে কখনোই তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সমাজে নানারকমের মানুষ থাকে, সবাইকে ধারণ করেই এগুতে হবে। নাহলে ঐ কম্পুচিয়ার মত হবে, যে সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ মানুষকেই আপনি মেরে ফেলবেন! আপনি সমাজতন্ত্র করবেন কি মানুষের কংকাল দিয়ে, মাথার খুলি দিয়ে?! মানুষ সবার উপরে। রবীন্দ্রনাথ, লালন এবং বাংলার মানবিক ঐতিহ্যের বিষয়টি হয়তো আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। আমার এই পরিবর্তনে পরবর্তীতে অনেকেই তেমন খুশী হতে পারেনি। তবে আমার কাছে মানুষ, নিপীড়িত মানুষ সবসময়ই সবচে গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত আদিবাসীদের নিয়ে ***'কর্ণফুলীর কান্না'*** ছবি তৈরী করেছি। আবার আপনি জানেন যে আমি বিহারীদের নিয়েও ছবি বানিয়েছি-- ***'স্বপ্নভূমি'***। একাত্তর সালে বিহারীদের নৃশংসতা আমি কাছ থেকে দেখেছি। তারপরও আমার মনে হয়েছে, ওরাও মানুষ। ওদের সমস্যাও তুলে ধরা আমার কর্তব্য।

প্রশ্ন : ৫১) বিহারীদের নিয়ে ছবি বানাতে গিয়ে হয়তো অনেকেই আপনার সমালোচনা করেছে। কিন্তু আপনিতো মানবতাকে তুলে এনেছেন?

উত্তর : যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী, তারা হয়তো বলবেন এটা ঠিক হয়নি, বাঙালি ফিল্ম মেকার হয়েও আমি কেন বিহারীদের বেদনার বিষয়কে তুলে এনেছি? আসলে আমি বিশ্বাস করি যে জাতি, ধর্ম, বর্ণের উর্ধ্বে উঠতে না পারলে আমরা কেমন শিল্পী? বহু বছর আগে চন্ডীদাস বলে গেছেন *সবার উপরে মানুষ সত্য*। তবে এটা বলা যত সহজ বাস্তবে প্রয়োগ করা কিন্তু কঠিন। কারণ কোনো মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখার আগে তার ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, এসব বিষয়গুলো এসেই পড়ে। তবে মানুষকে যদি তার ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, বর্ণ এসবের উর্ধ্বে দেখতে নাই পারলাম তাহলে রবীন্দ্রনাথ বা লালনের কাছ থেকে আমরা কীই-বা শিখলাম?! ছত্রিশ বছর ধরে বিহারীরা ক্যাম্পের আট ফুট বাই আট ফুট ঘরে বাস করছে। কি অমানবিক জীবন! আমরা বাঙালিরা একাত্তর সালে মাত্র নয় মাস ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে ফিলাম। তাতেই আমরা জেগেছি, দেশ স্বাধীন না হলে আর বাঁচা যাবে না! আর তারা ছত্রিশ বছর ধরে এরা ক্যাম্পে বসবাস করছে, আমাদের বাড়ীর কাছেই। আমরা ক'জন শিল্পী-সাহিত্যিক গেছি তাদের দেখতে?

প্রশ্ন : ৫২) *কর্ণফুলীর কান্না* প্রামাণ্যচিত্র তৈরীর পিছনে কি আপনার একই ধরনের আবেগ কাজ করেছে?

উত্তর : হ্যাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সমস্যা চলছে। বর্তমানে যদিও কিছু বুদ্ধিজীবি আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু একসময় কেউ তাদের দূর্দশার কথা, বঞ্চনার কথা বলতেন না। ফলে আমি সব সময় একটা অপরাধবোধে ভুগতাম। ছোটবেলায় ঐ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছি। কি অপূর্ব সুন্দর জায়গা! অথচ ওই জায়গায় সামরিক অভিযান হচ্ছে, মানুষ

মারা যাচ্ছে, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। জার্মান নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস ঢাকায় এসেছিলেন। একবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে এক শিক্ষকের রুমে সবাই মিলে বসেছেন। বাংলাদেশের সেরা অনেক কবি-সাহিত্যিক ছিলেন সেখানে, গল্প-টল্প হচ্ছে। তার কয়েকদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা গণহত্যা হয়েছিল। গুন্টার গ্রাস তখন জানতে চাইলেন, *আচ্ছা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে এত বড় যে একটা গণহত্যা হল, এ নিয়ে তোমরা কে কি লিখেছো?* ঘরে তখন পিনপতন নীরবতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে! কেউই তো কিছু লেখেননি! বাংলাদেশের সেরা সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবি অনেকেই ছিলেন ওখানে। এর মধ্যে একজন শিক্ষক, বোধ হয় বিএনপি-টিএনপি করেন, তিনি উঠে সরকারী ভাষ্যটা আওড়াতে লাগলেন! মানে বলতে লাগলেন যে-- *ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদী,* ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখছি, গুন্টার গ্রাসের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে! উনি রেগে লাল হয়ে যাচ্ছেন। তিনি তখন ঐ শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বললেন, *তোমাকে একটা কথা বলি, ১৯৭১ সালে আমার বয়স বেশ কম ছিল। তোমাদের উপর যখন অত্যাচার হচ্ছে, গণহত্যা হচ্ছে, তখন আমাদের চিন্তা ছিল, কিছু করতে হবে। কি করবো ? ভাবছিলাম গেরিলা হব, যুদ্ধ করবো। তখন আমি এবং আমার এক বন্ধু করাচী পর্যন্ত এসেছি, ঘোরাঘুরি করছি। লেখালেখি করে তখন আমার কিছুটা নাম হয়েছে। ফলে করাচী ইউনিভার্সিটি আমাকে দাওয়াত দিয়েছে কিছু বলার জন্য। বলা-টলার পর আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, পূর্ব পাকিস্তানে তো এমন গণহত্যা হচ্ছে, তোমরা পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিকরা কে কি করেছো? তখন একজন দাঁড়িয়ে যা বললো এবং তুমি যা বললে তা একই* ! এটা ছিল ওই শিক্ষকটি এবং উপস্থিত তাবৎ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিই এক প্রচন্ড একটা শ্লেষ, ঠাট্টা! একাত্তর সালে পাকিস্তানীরাও তো আমাদের *বিচ্ছিন্নতাবাদীই* বলতো। কিন্তু বিএনপি-করা ওই শিক্ষকটি এতই ভোঁতা ছিলেন যে গ্রুন্টার গ্রাসের এ কথার পরও উনি নানা যুক্তি দেখাতে শুরু করলেন! অন্যরা তখন তাঁকে থামায়। আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। তখনই সিদ্ধান্ত নিই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি একটা ছবি বানাবই।

তবে সেই মুহূর্তে শুটিং-য়ের দলবল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেয়ে ছবি বানানো সম্ভব ছিল না। কারণ চারিদিকে আর্মি ভরা। ফলে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে আদিবাসীদের আসল চিত্র তুলে আনা তখন সম্ভব হোত না। আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে যখনই শান্তি চুক্তি হয়েছে, পরিবেশ কিছুটা ভাল হয়েছে, তখনই আমি কাজটি করেছি। ***'স্বপ্নভূমি'*** বা ***'কর্ণফূলীর কান্না'*** এসব ছবি আমাকে আমার বিবেকের কাছে দায়মুক্ত করেছে। না হলে, আমি প্রচন্ড মনোকষ্টে থাকতাম।

প্রশ্ন : ৫৩) *'কর্ণফূলীর কান্না'* ছবিটাতো একসময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল?

উত্তর : সরকার ছবিটা নিষিদ্ধ করেছিল। আমরা তখন হাইকোর্টে রীট করি। ড. কামাল হোসেন আমার পক্ষে আদালতে দাঁড়ান এবং এত ভালো বলেছিলেন যে সরকার মামলায় হেরে গেল। সরকার তো বেআইনীভাবে ছবিটা আটকিয়েছিল। এখনও অবশ্য সরকারীভাবে ছবিটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা হয়নি। কিন্তু ডিভিডি বাজারে বিক্রি হয়। সরকারও আর কিছু বলে না।

প্রশ্ন : ৫৪) আপনার ইউনিভার্সিটি জীবন কবে শেষ হয়?

উত্তর : শেষমেষ ১৯৭৯-য়ে বের হয়েছি। পরীক্ষাতো অনেক দেরী দেরী করে হোত। আমার ইউনিভার্সিটি জীবন মানে ক্রিকেট খেলোয়াড় থেকে কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়া। সারাক্ষণ রাজনীতির কাজ করা আর প্রতিষ্ঠানিক পড়াশোনাটাকে অবহেলা করা। কিন্তু চিত্তের বিকাশের

জন্য প্রচুর পড়াশুনা করা হয়েছে। ঝড়ের মত ব্যস্ত জীবন কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, তবে লেখালেখির অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল। আমরা *পদাতিক* নামে ছোট একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করতাম। বামপন্থী ধাঁচের। ওখানে কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এসব ছাপানো হোত। *'পদাতিক'*-য়ে আমার প্রথম কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র নিয়ে লেখা, *পথের দাবী* নিয়ে। ইংরেজ কবি শেলীকে নিয়ে। কিছু অনুবাদও। তখন *গণসাহিত্য* নামে খুব ভালো একটি পত্রিকা বের হোত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার শেষের দিক থেকে আমি *গণসাহিত্য* পত্রিকায় কাজ শুরু করি। *"গণসাহিত্য"*-র কার্য্যকরী সম্পাদক ছিলেন মফিদুল হক। আমি মফিদুল ভাইয়ের সঙ্গে থেকে কাজ করতাম। তখনকার কমিউনিস্ট পার্টিতে বেশ কিছু বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। তখন আমরা তরুণ, কাজ করতে ভালবাসি। পরিশ্রম করতে ভালবাসতাম। ফলে ঐ পত্রিকায় খুব ভালোভাবে জড়িয়ে যাই। *গণসাহিত্য*-তে লেখালেখি করা, লেখাসংগ্রহ করা, প্রেসে প্রুফ দেখা ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকতাম। এই পত্রিকাতেই তারাশঙ্করের উপর, এলিয়েশনের উপর, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের উপর, গ্রামসির উপর, আমার লেখা বের হয়। আস্তে আস্তে সিভিল সোসাইটির নানা বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করি। এখনতো সিভিল সোসাইটি মানে দেখি পাঁচ তারা হোটেলে সভা। আশির দশকে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিল। শ্রমিক শ্রেণীতো নিজেরা সব কিছু পারে না। তার চারপাশে বুদ্ধিজীবিদের একটা ছত্রছায়া দরকার। চিন্তাচেতনায় তীক্ষ্ম, যাঁরা লিখতে পারবেন, গুছিয়ে বলতে পারবেন, আধুনিক মিডিয়াকে যাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন, আমরা সিভিল সোসাইটি বলতে এটাই বুঝতাম।

প্রশ্ন : ৫৫) দলের এই তাত্ত্বিক কাজে কি আনন্দ পেতেন ?

উত্তর : তাত্ত্বিক কাজ করতে আমার ভালোই লাগতো। তবে বিপ্লবের জন্যে আরো প্রত্যক্ষ কাজ করতে চাইতাম। কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন কৃষক সমিতি আগে থেকেই ছিল। কিন্তু যেহেতু তখন বাংলাদেশের ষাট ভাগ মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়েছে ফলে পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হোল যে ক্ষেতমজুর সমিতি গঠন করতে হবে। যারা মজুরীর ভিত্তিতে কৃষি জমিতে কাজ করে সেই ভূমিহীনদের জন্য সংগঠন গড়তে হবে। তো আমি এটা করতে চাইলাম। পার্টির নেতারা প্রথমে উৎসাহ দেখালেন না । তারা বললেন, *তোমারতো নাগরিক ব্যাকগ্রাউন্ড, লেখাপড়ার জগতের মানুষ, এ কাজটা তোমার জন্যে ঠিক হবে কী-না!* তখন আমি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য। ওখানে নানা রকম অবদান রাখি। তাই হয়তো নেতারা ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু আমি খুব ভাগ্যবান যে আমি জোর করেছিলাম ক্ষেতমজুর সমিতি করার জন্য। তারপর আমি কয়েক বছর ক্ষেতমজুর সমিতি করি ।

প্রশ্ন : ৫৬) ক্ষেতমজুর সমিতি নিয়ে কিছু কি লিখেছেন ?

উত্তর : আমার একটা বই আছে এই বিষয়ে। *ক্ষেত মজুর আন্দোলন: শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য* নামে।

প্রশ্ন : ৫৭) ক্ষেতমজুর সমিতি কি ঢাকা থেকেই করতেন ?

উত্তর : না। ঢাকায় ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় একটা অফিস ছিল বটে, কিন্তু আমাদের কাজটা ছিল মূলত: বাইরে বাইরে, গ্রামাঞ্চলে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে যেতে হোত। খুলনা বিভাগেই আমাকে বেশি কাজ করতে হয়েছে । তবে রংপুর, দিনাজপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, চট্টগ্রাম সব জায়গাতেই যেতে হত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমরা সংগঠন, সমিতি গড়তাম। ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গেই থাকতাম। এই কাজটা আমাকে জীবনে

অনেক কিছু শিখিয়েছে। মানুষ, জীবন ও আমাদের দেশটা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে যা শিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছি ক্ষেতমজুর আন্দোলন করে ।

প্রশ্ন : ৫৮) বলতে পারি আপনি বাংলাকে অন্য ভাবে দেখলেন ?

উত্তর : আগে একটা তাত্ত্বিক অবস্থা থেকে দেখতাম, এখন তলা থেকে জানতে, দেখতে পারলাম। আর এই তলা থেকে দেখতে পারায় আমার খুবই উপকার হয়েছে। মানে বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতা, কৃষির বাস্তবতা, জমি ও দারিদ্র্যের বাস্তবতাকে জানতে পেরেছি। এমন সব পরিবারে আমাকে থাকতে হয়েছে যাদের কোনো খাওয়া থাকত না। আমাদের দেশের মানুষের দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থাটা আমি বেশ কাছ থেকে দেখতে পেরেছিলাম। তাতে একজন সংগঠক হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে আমার লাভ হয়েছে অনেক অর্থাৎ অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু শারীরিকভাবে আবার কিছু ক্ষতিও হয়েছে। হয়তো অতিরিক্ত ভ্রমণ করার ফলে। কারণ সারাক্ষণ বাসে বাসে ঘুরতে হোত। ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন পার্টির নেতারা বললেন, *অনেক বিপ্লব হয়েছে, এবার তুমি ঢাকায় আসো!* ওঁরা সবসময় চাইতেন আমি যেন ঢাকায় থাকি। কারণ আগে আমি ঢাকায় যে কাজ করতাম সেই কাজের জন্য, তাঁদের মতে, আমাকে প্রয়োজন। তখন আমি আবার পার্টির তাত্ত্বিক কাজে জড়িত হলাম। তাঁর কিছু পরেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংকট সৃষ্টি হল।

প্রশ্ন : ৫৯) আপনাদের সময় আপনারা যে স্পিরিট নিয়ে বাম আন্দোলন করতেন এখন কি বাম আন্দোলনে তেমন স্পিরিট আছে ?

উত্তর : বাম দলগুলোর মধ্যে এখনও হয়তো কাঠামোটা আছে, তবে আত্মাটা নাই।

প্রশ্ন : ৬০) দলের সাথে প্রথম সম্পৃক্ততা কবে শুরু হয়েছিল আর শেষ হোল কবে ?

উত্তর : ১৯৭৪-য়ের দিকে শুরু আর শেষ হোল ১৯৮৯-য়ের দিকে।

প্রশ্ন : ৬১) ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর চাকরী করার চিন্তা কি করেছিলেন ?

উত্তর : না, আমি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম পেশাদার বিপ্লবী হব। আমি পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলাম। যে সামান্য হাতখরচ পেতাম, আমার একার পক্ষে চলে যেত। সেসময় আমি টিউশনিও করতাম। আমরা কয়েক কমরেড মিলে একটা কমিউন মত করে থাকতাম। ব্যাচেলর তো, তাই আমার বেশী খরচ হোত না। পরে আমি আমার বড় ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে থাকতাম। আমি যেহেতু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতাম ফলে খুব সামান্য হলেও আমার কিছু আয় ছিল। তাছাড়া আমার সিগারেট বা এরকম কোন বাড়তি খরচও ছিল না।

প্রশ্ন : ৬২) আপনার এমন সব কর্মকান্ড আপনার পরিবার কেমনভাবে নিয়েছিল ?

উত্তর : তারা হয়তো বিষয়টা খুব একটা পছন্দ করতেন না, অদ্ভুতই মনে হোত তাদের কাছে। কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন। বোনেরা চেচাঁমেচি করলেও আদর-স্নেহ করতো। সুযোগ পেলে আদর করে খাইয়েও দিত! ভায়েরা বলতো এর ভবিষ্যৎ কি? বাবা-মা চিন্তা করতেন। আবার সবাই এটা বুঝত যে, আমি যে কাজটা করছি সেটা অন্যায় কিছু না। পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা বের হচ্ছে।

তখন আমি ***'হুলিয়া'*** বানিয়েছি। ফলে একটু নামও হয়েছে আমার, ফলে তারা কিছুটা তৃপ্তিও হয়তো পেতেন।

প্রশ্ন : ৬৩) চলচ্চিত্র নির্মাণকে কি আপনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন?

উত্তর : পেশা বলতে যা বোঝায়, আমার কাছে সিনেমা এখনো সেরকম নয়। এটা আমার কাছে শিল্পসৃষ্টির একটা মাধ্যম মাত্র। আমি ফিল্ম বানাই, তার জন্য কিছু অর্থ আসে আমার কাছে, সেজন্যে আমি চলতে পারি। কিন্তু লেখালেখি থেকেও আমার কিছু অর্থ আসে। অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ করেও অর্থ আসে। তবে অর্থের প্রশ্নে যদিও আমি পেশাদার চলচ্চিত্র-নির্মাতা নই, কিন্তু ছবি তৈরীর কাজটি যখন করি তখন কাজের ক্ষেত্রে একটা পেশাদারিত্ব তো থাকতেই হয়। আমি মূলত: একজন শিল্পী। কখনো ছবি বানাতে ইচ্ছে করলে আমি ছবি বানাবো, নাটক লিখতে ইচ্ছে করলে নাটক লিখবো বা কবিতা লিখব। এটাই আমার চিন্তা। আমার যেটা ইচ্ছা সেটাই আমি করবো। আমি টাকার জন্য কখনো ছবি বানাই না। কেউ যদি আমাকে অনেক অনেক টাকা দিয়ে বলে এই ছবিটা বানাও, আমি অবশ্যই বানাবো না। আমি যে ছবিটা সৃষ্টি করতে চাই শুধু সেটাই করব আর সে ছবিটা তৈরী করতে আমি না খেয়ে থাকতেও রাজি আছি! আসলে আমার প্রতিটি ছবিই আমার ও আমার সহকর্মীদের জন্যে এক একটা কঠিন সংগ্রাম। তবে এই স্বাধীনতাটা আমি বজায় রাখতে চাই। আমার ছবি নির্মাণে যাঁরা আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন, শিল্পনির্দেশক উত্তম গুহ, আবহসঙ্গীতশিল্পী সৈয়দ সাবাব আলী আরজু, তাঁরাও এ বিষয়টি জানেন এবং আমার ছবিতে তাঁরা সেভাবেই কাজ করেন। লেখালেখির ক্ষেত্রেও তাই। আমি একটা কলমও ছোঁয়াতে চাইনা যদি না সে লেখাটা আমার ভিতর থেকে আসে।

প্রশ্ন : ৬৪) আপনার কাহিনীচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় মূলত: আপনি মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশভাগের বেদনাকে তুলে এনেছেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় খুবই স্পষ্ট, তা হচ্ছে নদী। আপনার কাহিনীচিত্রের নাম *নদীর নাম মধুমতী, চিত্রা নদীর পারে*। ঠিক তেমনি প্রামাণ্যচিত্রের নাম *অয়ি যমুনা* বা *কর্ণফুলীর কান্না*। তাছাড়া অন্যান্য ছবিগুলোতেও আমরা নদীর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এগুলো কি সচেতনভাবে করেছেন এবং এর কারণ কি?

উত্তর : আমাদের এ দেশটাতো নদীমাতৃক দেশ, প্রতি পাঁচ-দশ মাইল অন্তর একেকটা নদী। আমাদের এই গ্রাম, বন্দর, নগর, সভ্যতা, সবইতো নদীকে কেন্দ্র করে। নদী আমাদের জীবনশিরা। নদী আমাকে ছেলেবেলা থেকেই টানে। কিছুটা দার্শনিক পরিভাষায় যদি বলি যে, নদীর এই প্রবাহমানতা আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। চারপাশে এতকিছু ঘটে, নদী কিন্তু ঠিকই বয়ে যেতে থাকে। নদী সবই দেখে। কিন্তু তার মত করে চলতে থাকে, জীবনের মতই। একজন শিল্পীরও এমনি হওয়া কাম্য। নদী যে আমাকে এত টানে, সে কারণেই হয়তো আমার নিজের কোনো জমি নেই, বাড়ী নেই, কিন্তু আমার একটা নৌকা আছে। ধলেশ্বরীতে থাকে। যখন ঢাকা শহর ভালো লাগে না, তখন বইপত্র নিয়ে নৌকায় চলে যাই।

প্রশ্ন : ৬৫) আপনার প্রায় সব চলচ্চিত্রেই আমরা মানবসৃষ্ট ক্ষত দেখি। সেটা *'স্মৃতি-৭১'* থেকে শুরু করে *'স্বপ্নভূমি'* পর্যন্ত। আপনি কি ক্ষত সৃষ্টিকারীদেরকে নদীর কাছে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ে যেতে চান?

উত্তর : আমার অবচেতন মনে বিষয়টি কাজ করে থাকতে পারে। ***'নদীর নাম মধুমতী'****-র* শেষ শট্‌টি সেরকমই প্রতীকী কিছু ছিল। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটি তার বাবা বা চাচাকে হত্যা করার পর দৌড়ে

চলে আসে নদীর কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে আঁজলা ভরে নদী থেকে পানি নিয়ে পান করে। সাউন্ডট্রাকে গান ভেসে আসে *"এই পদ্মা, এই মেঘনা...এ আমার দেশ!"*

প্রশ্ন : ৬৬) আপনার চলচ্চিত্র নির্মাণে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম এ্যপ্রিসিয়েশন কোর্স কেমন প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর : ফিল্ম আর্কাইভের কোর্সটি করার অনেক আগে থেকেই আমি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। ওখানেই মূলত আমার চলচ্চিত্রিক ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠে। তাছাড়া আমার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজকর্মের জন্য আর্কাইভের কোর্সের ক্লাসগুলোও আমি নিয়মিত করতে পারিনি। প্রয়োজনও বোধ করিনি। তবে ফিল্ম আর্কাইভের সেই কোর্সের সূত্র ধরেই আলমগীর কবীরের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় যাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আর ফিল্ম আর্কাইভের ঐ কোর্সে আমি ***হুলিয়া***-র চিত্রনাট্য লিখেছিলাম যেটা নিয়ে আমার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করি।

প্রশ্ন : ৬৭) বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটিতে কত বছর যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : ছাত্রজীবনে *ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিনে সার্কেল* করতাম। পরে *বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটি* বা *বিএফএস*-য়ের সঙ্গে কয়েক বছর যুক্ত ছিলাম। এরপরে আমরা *ঋত্বিক ফিল্ম সোসাইটি* করি। সেখান থেকে *'মন্তাজ'* নামে একটা ভালো পত্রিকা বের হোত। তারপরে চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাজে আমি খুব বেশী জড়িয়ে গেলাম। ফলে সরাসরি ফিল্ম সোসাইটি করার সুযোগ আমার খুব একটা আর ছিল না।

'হুলিয়া', ***'আগামী'*** এসব ছবি তৈরী হওয়ার পরে আমরা *বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম* তৈরী করি-- বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চলচ্চিত্রকর্মীদের নিজস্ব সংগঠন। মোর্শেদুল ইসলাম, তারেক মাসুদ, মানজারে হাসিন মুরাদ ও আরো অনেকে ছিল। এখানে আমাকে বেশ সময় দিতে হোত। আর এখন তো আমরা নিজেদের *ফিল্ম ইনস্টিটিউট* ও *ফিল্ম সেন্টার* তৈরী করেছি। এখানেও আমাকে অনেক সময় দিতে হয়। তবে এতে আমার আপত্তি নেই। কারণ আমি নিজের ভেতরে ঠিক করেছি যে যখন ফিল্ম তৈরী করব না তখন ফিল্ম-মেকার তৈরী করার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : ৬৮) লেখালেখিতেও তো আপনি সময় ব্যয় করেন?

উত্তর : লেখালেখিতে আমার অনেক সময় যায়। আমার প্রথম দিকে দুটো বই বের হয়েছিল *মার্কসবাদ ও সাহিত্য* এবং *চলচ্চিত্র নন্দনতত্ত্ব: বারোজন ডিরেক্টর*। নামেই বুঝতে পারছেন একদিকে মার্কসবাদ আর অন্য দিকে সিনেমা! দুটোই তখন আমার পাশাপাশি চলছিল। তার পর আমি আরো কিছু বই লিখি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র উপর *"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা"* নামে একটা সাহিত্য সমালোচনামূলক বই ছিল আমার। আমি মনে করি, দুই বাংলার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ অবশ্যই প্রথম সারির। কিন্তু তাঁকে নিয়ে অত চর্চা নেই। বইটিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র আঙ্গিক ও দার্শনিক গভীরতার বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। শুনেছি বইটি বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকদের বেশ কাজে লাগে। কবি শামসুর রাহমান আমাকে একদিন বলেছিলেন, *তানভীর হচ্ছে আমাদের মত লেখকদের লেখক* ! প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী এসব আমি নিয়মিত লিখি, এছাড়া অনুবাদও করি। মাঝে মাঝে কবিতাও লিখি।

প্রশ্ন : ৬৯) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার চলচ্চিত্র অবশ্যই উল্লেখ করার মত। তারপরও কি কালজয়ী কিছু করার চেষ্টা করছেন?

উত্তর : "কালজয়ী" কিছু সৃষ্টি করব ওভাবে তো শিল্প হয় না! আন্তরিকভাবে শিল্প সৃষ্টি করার চেষ্টা করে গেলে কোনোটা কালজয়ী হয়, কোনোটা হয় না। আমার দু'একটি চলচ্চিত্র হয়তো সমকালকে অতিক্রম করতে পেরেছে। আর কোন্ চলচ্চিত্র কালজয়ী হবে, কোন্টা হবে না, কে আসলে সেটা বলতে পারে! আমি মনে করি বাংলাদেশের সীমিত প্রযুক্তিতে তৈরী আমাদের ছবিগুলিতে আমরা যদি আন্তরিকভাবে স্বদেশ ও আমাদের সময়কালকে তুলে ধরতে পারি, তাহলেই সেটা কালজয়ী হবে। সে চেষ্টা তো সবসময় থাকেই।

প্রশ্ন : ৭০) বর্তমানে কী করছেন?

উত্তর : বর্তমানে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা বড় প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেভাবে বিকৃত হচ্ছে, সেজন্য ছবিটির কাজ আসলে আরো আগেই শুরু করা উচিৎ ছিল। কিছুদিন আগে দিল্লীতে গিয়ে জেনারেল জ্যাকবের সাক্ষাৎকার নিয়ে এসেছি। ওঁর তো বয়স একাশি বছর হয়ে গেছে! জেনারেল মানেকশ মারা গেছেন, জেনারেল অরোরা মারা গেছেন। সেই সাথে ১৯৭১ সালে ভারতের যে সব জায়গায় শরণার্থী ক্যাম্প হয়েছিল সেরকম কিছু জায়গাতেও গিয়েছিলাম-- বনগাঁ, গাইঘাটা এসব অঞ্চলে। সেই সময়তো আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল ভারতের সর্বস্তরের মানুষ। তারা তখন প্রচুর কষ্ট করেছেন ও ঝামেলা সহ্য করেছিলেন। আমরা এঁদেরকে তেমন স্মরণ করি না। খুবই অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা! এরকম কয়েকজনের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। তাঁরা খুবই খুশি হয়েছেন। উৎসাহভরে তারা সেই সময়ের কথা বলেছেন।

প্রশ্ন : ৭১) *১৯৭১* প্রামাণ্যচিত্রের ক্যানভাসটা কেমন হবে?

উত্তর : এটা একটা বড় গবেষণাধর্মী প্রামাণ্যচিত্র হবে। পুরোপুরিই গবেষণাধর্মী। এটাতে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার রাজনীতি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, মুক্তিযোদ্ধারা, যুদ্ধ, গণহত্যা, নারী নিপীড়ণ, শরণার্থী সমস্যা সবকিছুই থাকবে। এটারই একটা বাই প্রডাক্ট বলতে পারেন ***তাজউদ্দীন আহম্মদ: নিঃসঙ্গ সারথি*** এবং ***স্বপ্নভূমি*** ছবি দু'টি। আমি একাত্তর সাল নিয়ে কাজ করছি বলেই এই দুটি ছবি তৈরী করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন : ৭২) *১৯৭১*-য়ের কাজ কবে থেকে শুরু করেছেন?

উত্তর : এটা বছর তিনেক হল। আমি খুবই বিরক্ত ছিলাম যেভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছিল। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর! পাল বা সেন যুগের ইতিহাস নিয়ে হয়তো পন্ডিতেরা তর্ক করতে পারেন কিন্তু যেসব ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে সেটা পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং মানুষকে তা বিশ্বাস করানোর অপচেষ্টাটা খুবই হাস্যকর। এদেশের কোন কোন মহলের এ প্রচেষ্টাটা আমার কাছে একটা ভয়াবহ বিরক্তির ব্যাপার ছিল! ফলে একাত্তরের উপর আমি এই গবেষণামূলক ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নিই। পরবর্তী প্রজন্ম দেখুক, জানুক, যে আসলে কি কি ঘটেছিল।

প্রশ্ন : ৭৩) ছবিটার দৈর্ঘ্য কত বড় হবে?

উত্তর : আমি দু'ঘন্টার মধ্যে রাখতে চাই। তবে ইতিমধ্যে আড়াইশ ঘন্টার ফুটেজ আমরা শুট্ করেছি। তবে আমি সেটা ইচ্ছে করেই করেছি। আমার আরো শুটিং করার ইচ্ছা। কারণ এসব ফুটেজ আমি ধরে রাখতে চাই একটা আর্কাইভাল আগ্রহ থেকে। ছবি বানানোর পরে অবশিষ্ট অংশ কোন ফিল্ম আর্কাইভ, মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থায় দিয়ে দেব। যাতে ভবিষ্যতে যারা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি করতে চাইবে, তারা যেন ওখান থেকে এসব ফুটেজ পায়। আমরা তো আর চিরকাল থাকব না!

= o =